অরিত সাহা

নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি

তথ্য-সংকলন ও গ্রন্থনা
মোহিত রায়

সম্পাদনা
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আই. এ. এস. (অবসরপ্রাপ্ত)
বিশেষ আধিকারিক, পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ও
অধ্যাপক সুধীররঞ্জন দাশ, এম. এ.; পি. এইচ. ডি.; এফ. এ. এস.
অধ্যক্ষ, পুরাতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়



পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রকাশনা এবং © :
পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুদ্রণ ও ব্লক :
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড

প্রচ্ছদপটশিল্পী :
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

মানচিত্র :
শ্রীঅর্ধেন্দু দত্ত
ও
পূর্ত (সড়ক) বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুদ্রাকর :
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম মুদ্রণ :
৪,৪০০ কপি

প্রথম প্রকাশ :
ভাদ্র, ১৩৮২
আগস্ট, ১৯৭৫

মূল্য ৫·০০ টাকা

মুখবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ এ রাজ্যের প্রতিটি জেলা এবং কলকাতার যাবতীয় পুরাকীর্তি ও পুরাবস্তুর বিশদ বিবরণ-সংবলিত যে ষোলটি গ্রন্থরচনার কাজে নিযুক্ত আছেন, এ বইটি সে সিরিজের চতুর্থ পুস্তক। ইতঃপূর্বে প্রকাশিত বাঁকুড়া, বীরভূম ও কোচবিহার জেলাসংক্রান্ত গ্রন্থগুলি যেরূপ বহুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, আশা করি, এটির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না। সহজ ভাষায় লেখা, বহু আলোকচিত্রশোভিত ও অতিশয় সুলভ এই গ্রন্থমালা সাধারণ বাঙালী পাঠকের জন্যই রচিত হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজ জন্মভূমির সুমহান পুরাতাত্ত্বিক ঐশ্বর্যগুলিকে আরও যথার্থভাবে জানবার অবকাশ পান। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার, বিশেষতঃ তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, যাত্রা, সিনেমা প্রভৃতির পুনরুজ্জীবন-প্রয়াসের মাধ্যমে চিরায়ত বঙ্গসংস্কৃতিকে আবার তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন, সুপ্রণীত বর্তমান পুস্তকগুলি সে শুভ-কর্মোদ্যমেরই এক বিশিষ্ট ও স্থায়ী অঙ্গ।

যাঁদের ধারণা, নদীয়া জেলার প্রাচীন মন্দিরাদি কেবলমাত্র নবদ্বীপ ও শান্তিপুরেই সীমাবদ্ধ, এ পুস্তকে বর্ণিত ৬৩টি পুরাকীর্তিস্থল তাঁদের কাছে আমাদের এজাতীয় কৃষ্টিসম্পদের অপরিমেয়তার কথা প্রমাণ করবে। পুরাতত্ত্বের ছাত্র ও পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হিসাবে আমি এবং এ গ্রন্থমালার কৃতবিদ্য সম্পাদকদ্বয় প্রতিটি গ্রন্থের সর্ববিধ উৎকর্ষসাধনের জন্য প্রতিশ্রুত। বর্তমান সরকারের পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগের এই সাংস্কৃতিক সৎপ্রয়াস জনগণের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করবে এই দৃঢ় প্রত্যয়ই আমাদের সকল অনুপ্রেরণার উৎস।

সুব্রত মুখোপাধ্যায়
ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, পূর্ত (পুরাতত্ত্ব)
এবং তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণ
ভাদ্র, ১৩৮২ : অগস্ট, ১৯৭৫

গ্রন্থকারের নিবেদন

নদীয়া শ্রীচৈতন্যদেবের পবিত্র আবির্ভাবভূমি এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম পুরাকীর্তিসমৃদ্ধ জেলা। এখানকার পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত বহু মন্দির এবং শিবনিবাসের বৃহদায়তন ও বিরল রীতির দেবালয়গুলি নদীয়ারাজের সংস্কৃতিপোষকতার উজ্জ্বল নিদর্শন।

নদীয়ায় পাল-সেনযুগে নির্মিত যাবতীয় মন্দির আজ কালস্রোতে লুপ্ত। সেজন্য এ গ্রন্থে সেগুলির বিবরণ দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত ও রক্ষিত সে যুগের প্রস্তরমূর্তি প্রভৃতির বিস্তৃত বর্ণনা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

আলোচিত পুরাকীর্তিগুলির পরিচয় আমার দীর্ঘকালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ। স্থানীয় অধিবাসী হিসাবে এ জেলার যাবতীয় পুরাকীর্তি দীর্ঘদিন ধ'রে অনুসন্ধানের সুযোগ আমি পেয়েছি এবং বর্তমান পুস্তকে বর্ণিত প্রত্যেকটি পুরাকীর্তি ও পুরাবস্তু সরজমিনে দেখে সেগুলির তথ্য সংকলন করেছি।

মোটামুটিভাবে, জেলার প্রায় যাবতীয় পুরাকীর্তি ও পুরাবস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হলেও আমার অজানিত কোন কোন নিভৃত স্থানে উল্লেখ্য পুরাকীর্তি বা পুরাবস্তু থাকতেও পারে। তাদের সন্ধান পেলে, ভবিষ্যতে সেগুলি বিবৃত করবার আশা রাখি।

অদ্যাবধি নদীয়া জেলার কোথাও প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন করা হয়নি। বল্লালঢিপি ও সুবর্ণবিহার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল খনন করা হলে, অনেক নতুন ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান মিলতে পারে।

শ্রদ্ধেয় শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে অবিরত সাহায্য, পাণ্ডুলিপিটির আদ্যন্ত পরিমার্জনা এবং বহুক্ষেত্রে নতুন তত্ত্ব ও তথ্য সংযোজন করায় আমি তাঁর কাছে অতিশয় কৃতজ্ঞ। তাঁর গৃহীত ও পরিস্ফুটিত আলোকচিত্রগুলিও এ পুস্তকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। অধ্যাপক শ্রীসুধীররঞ্জন দাশের বিবিধ সাহায্যের জন্য আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীবিনয় ঘোষও প্রভূত উৎসাহ দিয়েছেন, আশীর্বাদ করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠালিপিগুলির সঠিক পাঠোদ্ধারে সহায়তা করায় আমি তাঁর কাছেও ঋণী। আরও অনেকের কাছ থেকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়ে আমি কৃতার্থ।

'খেয়া'
পোস্ট রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
ভাদ্র, ১৩৮২ : অগস্ট, ১৯৭৫

মোহিত রায়

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

পুরাকীর্তি গ্রন্থমালার বাঁকুড়া, বীরভূম ও কোচবিহার জেলাসংক্রান্ত প্রথম তিনটি পুস্তক বিভাগীয় আধিকারিকদের দ্বারা লিখিত এবং শেষেরটি আমাদের দ্বারা সম্পাদিত। পশ্চিমবঙ্গের কিছু জেলায় যোগ্য গবেষকরাও দীর্ঘকাল যাবৎ স্থানীয় পুরাতত্ত্বের অনুশীলনে রত আছেন। তাঁদের সহযোগিতা বিভাগীয় প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত হলে, এই বইগুলি যে আরও পূর্ণাঙ্গরূপে ও শীঘ্র প্রকাশ করা সম্ভব, প্রকাশন কমিটি সম্প্রতি সে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বর্তমান পুস্তকটি এই সিদ্ধান্তের প্রথম ফলশ্রুতি। গ্রন্থকারের বিস্তৃত অনুসন্ধানলব্ধ তথ্য সম্পাদকীয় স্তরে পুনর্বিন্যস্ত ও আদ্যোপান্ত পরিমার্জিত হয়ে যে শোভন রূপ নিয়েছে তা পাঠকসাধারণের সাধুবাদ লাভ করবে ব'লেই আমাদের বিশ্বাস। একই কারণে শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়কে ২৪-পরগণা ও মুর্শিদাবাদ এবং শ্রীতারাপদ সাঁতরাকে হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করবার ভার দেওয়া হয়েছে। সেগুলিও সম্পাদিত হয়ে অচিরেই প্রকাশিত হবে।

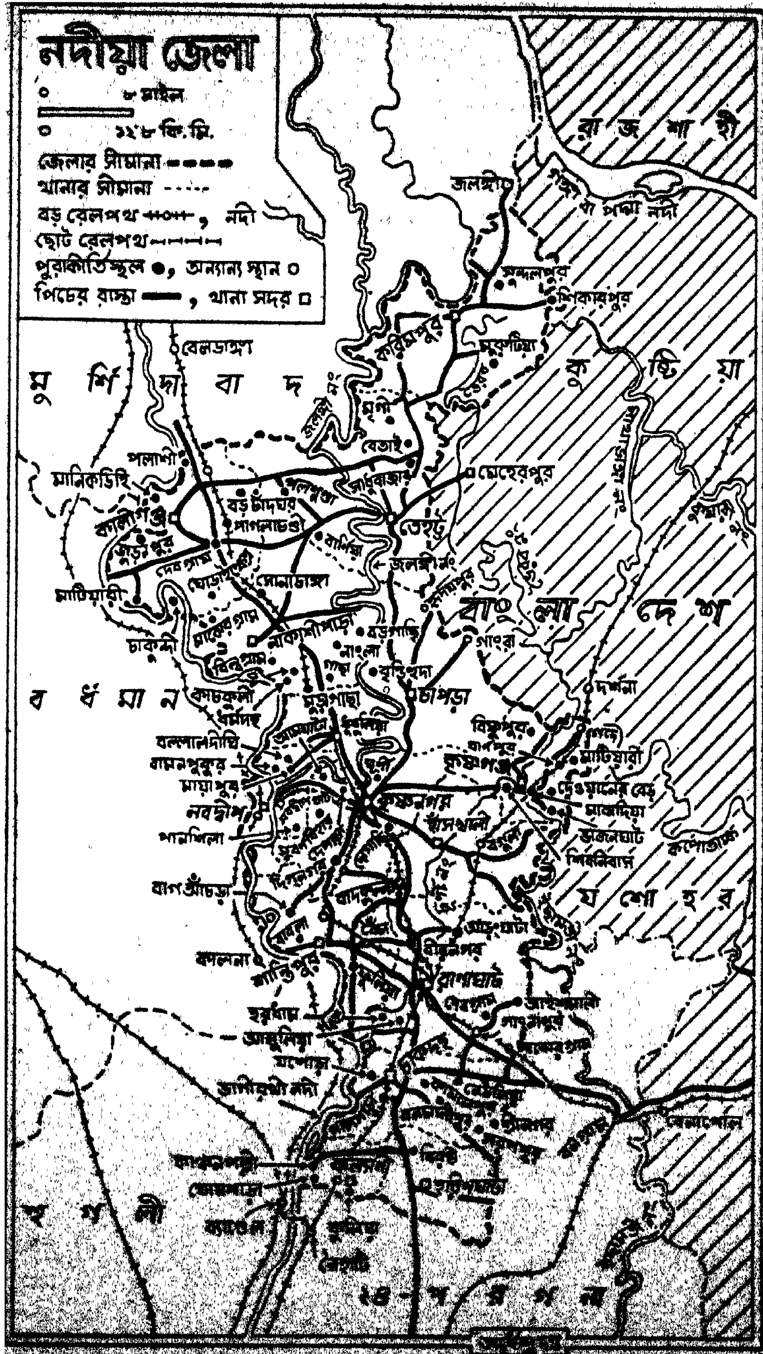
বর্তমান গ্রন্থের 'ভূমিকা' পরিচ্ছেদে অধ্যাপক দাশ গ্রহণ-বর্জনের যে বিস্তারিত পরামর্শ দেন এবং শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি বিষয়ে তাঁর ব্যাপক ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'পুরাকীর্তি পরিচিতি' অংশে যেসব পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের প্রয়োজন অনুভব করেন, তা সংশোধিত পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত করবার গুরুভার তিনি নিজেই বহন করেছেন। তা ছাড়া, 'প্রুফ' দেখা, মানচিত্রের পরিকল্পনা করা, বরেয়ার বুদ্ধমূর্তি ও পালপাড়ার মন্দির ব্যতীত অন্যান্য পুরাকীর্তির ছবিগুলি তাঁর নিজস্ব 'ডার্ক-রুমে' পরিস্ফুটিত ক'রে তাদের 'লে-আউট' স্থির করা এবং ছাপাখানার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগের মাধ্যমে এরূপ একটি সুমুদ্রিত পুস্তক প্রকাশনার যাবতীয় দায়িত্ব তাঁরই উপর ন্যস্ত ছিল।

গ্রন্থশেষের 'অনুক্রমণিকা'টির জন্য শ্রীতারাপদ সাঁতরা এবং মুদ্রণের কাজে অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য শ্রীসরস্বতী প্রেসের শ্রীদীপক ঘোষ ও তাঁর সুযোগ্য সহকর্মীরা আমাদের ধন্যবাদভাজন।

পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণ
ভাদ্র, ১৩৮২ : অগস্ট, ১৯৭৫

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সুধীররঞ্জন দাশ

সূচীপত্র



নদীয়া জেলা
০ ৮ মাইল
০ ১২.৮ কি.মি.
জেলার সীমানা
থানার সীমানা
বড় রেলপথ, নদী
ছোট রেলপথ
পুরাকীর্তিস্থল ●, অন্যান্য স্থান ০
পিচের রাস্তা, থানা সদর □
রাজশাহী
মুর্শিদাবাদ
কুষ্টিয়া
বাংলাদেশ
বর্ধমান
যশোহর
হুগলী
২৪-পরগনা
জলঙ্গী
পদ্মা নদী
শিকারপুর
করিমপুর
মুরুটিয়া
বেলডাঙ্গা
পলাশী
মানিকডিহি
বেতাই
মেহেরপুর
বড় চাঁদঘর
কালীগঞ্জ
তেহট্ট
মাটিয়ারী
সোনাডাঙ্গা
চাকুন্দী
নাকাশীপাড়া
চাপড়া
দর্শনা
ধর্মদহ
মুড়াগাছা
বল্লালদীঘি
মায়াপুর
নবদ্বীপ
কৃষ্ণনগর
কৃষ্ণগঞ্জ
মাজদিয়া
শিবনিবাস
বাগআঁচড়া
রাণাঘাট
শান্তিপুর
আড়ংঘাটা

ভূমিকা

ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক রূপরেখা—নদীয়া জেলা ২২°৫৩′ ও ২৪°১১′ উত্তর অক্ষাংশের এবং ৮৮°০৯′ ও ৮৮°৪৮′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত গাঙ্গেয় সমভূমি। ব্রিটিশ আমলে, ভারতের গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিল ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১ মার্চ তারিখের সভায়, রাজস্ব সংগ্রহের জন্য, নদীয়া নামের একটি স্বতন্ত্র জেলা এবং তার কালেক্টরের পদ সৃষ্টি করবার সিদ্ধান্ত নেন। তখন থেকেই কৃষ্ণনগর জেলার সদর শহর। নদীয়ার প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হন এফ. রেডফার্ণ।

দেশবিভাগের সময় (আগষ্ট, ১৯৪৭) নদীয়া জেলাও বিভক্ত হয়। বর্তমানে এ জেলার দুটি মহকুমা—কৃষ্ণনগর (সদর) এবং রাণাঘাট। নদীয়ার আয়তন ১,৫১৪.৯ বর্গ মাইল (৩,৯২৬ বর্গ কি.মি.)। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনা অনুসারে, এ জেলার মোট জনসংখ্যা ২২,৩০,২৭০। তার মধ্যে হিন্দু ১৬,৯৩,০০৬, মুসলমান ৫,২০,৫৭১, খ্রীষ্টান ১৬,৩৩৭, জৈন ১৬৮, শিখ ৭৭, বৌদ্ধ ৫৫ এবং অন্যান্য ৫৬ জন।

বর্তমান নদীয়া জেলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ জেলা, উত্তর-পূর্বে কুষ্টিয়া জেলা (বাংলাদেশ), দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে চব্বিশ-পরগণা জেলা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে, ভাগীরথীর অপরতীরবর্তী, বর্ধমান ও হুগলী জেলা।

এ জেলার প্রাকৃতিক গঠনে স্থানীয় নদীগুলির ভূমিকা উল্লেখ্য। ভাগীরথী ও অন্যান্য নদীর ভাঙাগড়ায় ও গতি পরিবর্তনে বিভিন্ন কালে নদীয়ার ভূগঠনেরও তারতম্য হয়েছে। ভাগীরথীই নদীয়ার প্রধান নদী। এই নদীর তীরেই, নবদ্বীপে এবং পলাশীতে, বঙ্গদেশে যথাক্রমে মুসলমান ও ইংরেজ অধিকারের সূত্রপাত হয়। অন্যান্য প্রধান নদী—জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা, চূর্ণী এবং ইছামতী। পলিমাটি প'ড়ে নদীগর্ভ যখন উঁচু হয়েছে তখন অপেক্ষাকৃত ঢালু দিকে নদী গতি পরিবর্তন করেছে। নদীয়ায় অনেক উপনদী এখন মজে গিয়েছে অথবা শুখিয়ে লুপ্ত হয়েছে। এক সময় এ এলাকায় নদীপথেই যাতায়াত হত ও ব্যবসাবাণিজ্য চলত। সেজন্য প্রধান নদীগুলির তীরে তীরে গড়ে উঠেছিল বহু জনপদ।

এ জেলার মাটি পলিপ্রধান এবং বেলে-দোআঁশ জাতীয়। ভূগর্ভস্থ জলস্তর বিশেষ নীচে নয়। কর্কটক্রান্তিরেখা নদীয়ার মাঝামাঝি

দিয়ে যাওয়ার ফলে, এখানকার জলবায়ুতে চরম ভাব অনুভূত হয়। গাঙ্গেয় সমভূমিতে অবস্থিত এ জেলার অর্থনীতি যে প্রধানতঃ কৃষিভিত্তিক তার অন্যতম প্রমাণ, নদীয়ার মোট গ্রামবাসীর সংখ্যা ১৮,১২,২১১ (৮১·২৫%) ও শহরবাসীর সংখ্যা ৪,১৮,০৫৯ (১৮·৭৫%)।

নবদ্বীপ থেকে নদীয়া নামের উৎপত্তি হয়েছে ব'লে অনেকে মনে করেন। প্রাচীন ইতিহাস এবং বৈষ্ণব গ্রন্থাদি অনুসারে, নবদ্বীপ হল নবদ্বীপমণ্ডলের কোলদ্বীপ বা কুলিয়া-পাহাড়পুর। গঙ্গার ভাঙনে প্রাচীন নবদ্বীপবাসীরা বিপন্ন হয়ে নিকটবর্তী কুলিয়ার চরে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন এবং এইভাবে বর্তমান নবদ্বীপ শহর গড়ে ওঠে। আবার অনেকের মতে, অন্তর্দ্বীপ-ই নবদ্বীপ। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' নামক শ্রীচৈতন্যজীবনীগ্রন্থে উল্লেখিত আছে, নবদ্বীপ একটিমাত্র দ্বীপ :

"নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলা গিয়া॥
সবে মাত্র গঙ্গা নবদ্বীপ কুলিয়ায়।
প্রভু পার হইয়া যায়েন কুলিয়ায়॥"

পক্ষান্তরে, নরহরি চক্রবর্তী (ঘনশ্যাম দাস)-কৃত 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থের নবদ্বীপ-পরিক্রমা অংশে আছে :

"নদীয়া পৃথক গ্রাম নয়।
নবদ্বীপে নবদ্বীপ বেষ্টিত যে হয়॥
নয় দ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম॥"

তাঁর মতে, নয়টি দ্বীপের সমষ্টি নবদ্বীপ। তিনি ঐ নয়টি দ্বীপের পরিচয়ও দিয়েছেন :

"গঙ্গা পূর্ব্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়।
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ শ্রীসীমন্তদ্বীপ হয়॥
গোদ্রুমদ্বীপ শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়।
কোলদ্বীপ ঋতু জহ্নু মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥"

মায়াপুরকেই তিনি শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান ব'লে উল্লেখ করেছেন :

"নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জনমিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥"

আবার, কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী-কৃত 'নবদ্বীপ-মহিমা' এবং 'নবদ্বীপ-তত্ত্ব' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, অন্তর্দ্বীপই প্রকৃত নবদ্বীপ এবং প্রাচীন নবদ্বীপ ও বর্তমান নবদ্বীপ শহর অভিন্ন এবং এখানেই শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হন। কারও কারও মতে, গঙ্গাগর্ভ থেকে নতুন উত্থিত দ্বীপ অর্থে নব দ্বীপ থেকে নবদ্বীপ নামের উৎপত্তি।

আর একটি মত—এক তান্ত্রিক রাত্রিকালে নয়টি দীপ জ্বেলে যে দ্বীপে সাধনা করতেন তার নাম হয় নবদীপ, যা থেকে নবদ্বীপ। এই একই কিংবদন্তীকে সামান্য পরিবর্তিতরূপেও পাওয়া যায়: নয়টি দিয়া (প্রদীপ) জ্বেলে এক তান্ত্রিক যে দ্বীপে সাধনা করতেন তার নাম নদীয়া (নয়+দিয়া)।

বর্তমান নদীয়া জেলা এলাকার সুপ্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে সঠিকভাবে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এমন কি সমগ্র বঙ্গদেশ কখনও মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা তাও সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয়নি। একমাত্র উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত মৌর্যযুগের ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত লিপি ভিন্ন এ বিষয়ে আর কোন অকাট্য প্রমাণ অদ্যাপি পাওয়া যায়নি। গুপ্তযুগে সমতট স্বাধীন রাজ্য ছিল ব'লেই অনুমান করা হয়। কারণ, এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে সমতট প্রত্যন্ত রাজ্য নামে উল্লিখিত হয়েছে। গুপ্তযুগের বিশেষ কোন নিদর্শনও নদীয়া জেলায় পাওয়া যায়নি। গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় বঙ্গদেশ সম্ভবতঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। স্কন্দগুপ্তের পরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন আরম্ভ হয়। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে তখন স্বতন্ত্র রাজ্য গড়ে ওঠে। ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গে একটি স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অদ্যাবধি আবিষ্কৃত ছয়টি তাম্রশাসন থেকে তিনজন নৃপতির নাম পাওয়া যায়—গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদেব। তাঁরা সকলেই মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের রাজত্বকাল ছিল ৫২৫-৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। এই রাজ্যই ছিল বঙ্গরাজ্য। বর্তমান নদীয়া জেলার এলাকা এই বঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল ব'লে মনে হয়। সে রাজ্যকে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালের কর্ণসুবর্ণ রাজ্য গড়ে ওঠে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে মহারাজ শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণকে রাজধানী ক'রে গৌড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবতঃ, আজকের নদীয়া জেলা এলাকা তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশে ব্যাপক অরাজকতা দেখা দেয়। সেই 'মাৎস্যন্যায়ে'র অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য, আনুমানিক

৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে, গোপাল নামে জনগণের মনোনীত একজন রাজপদে অভিষিক্ত হন। তিনিই পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পুত্র ধর্মপাল ছিলেন সে বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি। পাল-রাজকুল বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে পালযুগের কয়েকটি বৌদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। পালরাজারা অনেক বিহার ও সঙ্ঘারাম নির্মাণ ক'রে থাকলেও নদীয়া জেলায় তার কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন, কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে সুবর্ণবিহার ('পুরাকীর্তি পরিচিতি' পরিচ্ছেদের 'সুবর্ণবিহার' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য) পালরাজাদের স্মৃতি বহন করছে।

পাল-রাজত্বের পর বঙ্গদেশে সেনবংশীয় রাজাদের অভ্যুত্থান ঘটে। সেনরাজ সামন্তসেন বৃদ্ধ বয়সে ভাগীরথী ও জলঙ্গী নদীর সঙ্গমস্থলে বসতি স্থাপন করেন। সামন্তসেনের পরে রাজ্যভার গ্রহণ করেন তাঁর পৌত্র বিজয়সেন। অনেকের মতে, তিনি নবদ্বীপে রাজধানী স্থাপন ক'রে তার নামকরণ করেন 'বিজয়পুর'। অধিকাংশ ঐতিহাসিকই বিজয়সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিজয়পুরকে বর্তমান নবদ্বীপরূপে চিহ্নিত করেছেন।

বিজয়সেনের মৃত্যুর পর রাজা হন তাঁর পুত্র বল্লালসেন। তিনি বিদ্যাচর্চার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং নিজেও 'দানসাগর', 'অদ্ভুতসাগর', 'ব্রতসাগর', 'আচারসাগর' ও 'প্রতিষ্ঠাসাগর' নামে পাঁচটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। নবদ্বীপের কাছে, ভাগীরথীর পূর্বতীরে, বামনপুকুর গ্রামে একটি সুউচ্চ ও সুপ্রশস্ত ঢিপি বর্তমানে বল্লালঢিপি নামে পরিচিত। অনেকে মনে করেন, বল্লালসেনের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এই ঢিপিতে পরিণত হয়েছে। এখান থেকে পালযুগের কিছু কিছু নিদর্শনও পাওয়া গিয়েছে। তা ছাড়া অদূরে, মায়াপুরে, বল্লালদীঘি নামে একটি বড় দীঘিও দেখা যায়। এসব তথ্য ও লোকশ্রুতি থেকে অনুমিত হয় যে, নবদ্বীপ ও সংলগ্ন অঞ্চলেই সেনরাজাদের রাজধানী ছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন অকাট্য নিদর্শন বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

বল্লালসেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার ন্যায় তিনিও সাহিত্য ও নানাবিধ জ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জয়দেব, ধোয়ী, শরণ, উমাপতিধর, হলায়ুধ, পশুপতি, বটুকদাস প্রমুখ জ্ঞানীগুণীজন তাঁর রাজসভা অলংকৃত করতেন। তিনি বৈষ্ণবধর্মানুরাগী ছিলেন। সেনরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের রাজ্যে সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুধর্মের নবজাগরণ দেখা দেয়।

মুসলমান ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, লক্ষ্মণসেনের রাজধানীর নাম ছিল 'নূদীয়া'। এই নূদীয়াই যে নবদ্বীপ সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজকৃত 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' (রচনাকাল—১২৬০ খ্রীঃ) গ্রন্থ থেকে জানা যায়, লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে তুর্কী সেনাপতি মহম্মদ-ই-বখতিয়ার মাত্র আঠারোজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে নূদীয়া আক্রমণ করেন। লক্ষ্মণসেন সে সময়ে আহারে বসেছিলেন। এই অতর্কিত আক্রমণের কথা শুনে তিনি গুপ্তপথ দিয়ে ভাগীরথী অতিক্রম ক'রে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান। (শোনা যায়, রাজসভার জ্যোতিষীদের গণনায় অন্ধবিশ্বাসবশতঃ তিনি এ কাজ করেন)। তারপর লক্ষ্মণসেন ও পরবর্তী সেনরাজারা কিছুকাল পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন।

সেনরাজবংশ হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন। সেনযুগেরও কয়েকটি অল্পবিস্তর ভগ্ন প্রস্তরমূর্তি নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়েছে। তা ছাড়া, নদীয়া জেলার রাণাঘাট থানার আমুলিয়া গ্রামে ('পুরাকীর্তি পরিচিতি' পরিচ্ছেদের 'আমুলিয়া' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য) পাওয়া গিয়েছে লক্ষ্মণসেনের একটি লেখমালা বা তাম্রশাসন। এই লেখমালাটি নদীয়ার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সেনরাজাদের নির্মিত মন্দির, রাজপ্রাসাদ বা ইমারতের কোন নিদর্শন অদ্যাবধি এ জেলায় আবিষ্কৃত হয়নি।

মাত্র আঠারোজন অশ্বারোহীর সাহায্যে বখতিয়ারের নূদীয়া বিজয়ের কাহিনীটি বর্তমান ঐতিহাসিকেরা সম্পূর্ণরূপে সত্য মনে করেন না। এটি একটি উপকথা ব'লেই মনে হয়। তার অন্যতম প্রধান কারণ, মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজ এ ঘটনার বহুকাল পরে লক্ষ্মণাবতী নগরের নিজামউদ্দীন ও সম্‌সামুদ্দীন ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছ থেকে শোনা-কথার ভিত্তিতে এ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তবে একথা ঠিক যে, বখতিয়ার অতি সহজেই নূদীয়া অধিকার করেন এবং ব্যাপক লুণ্ঠন, পীড়ন ও নিধন চালিয়ে প্রচুর ধনরত্নাদি নিয়ে ফিরে যান। নূদীয়া যে পুরাপুরিভাবে বখতিয়ারের অধিকারভুক্ত হয়েছিল এমন কথাও সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে, অব্যবহিত পরবর্তীকাল থেকে, নূদীয়া মুসলমানদের শাসনাধীনে আসে। কোন কোন সময়ে বাংলার মুসলমান সুলতানরা দিল্লীর বশ্যতা অস্বীকার ক'রে নিজেদের স্বাধীন ব'লেও ঘোষণা করতেন। বখতিয়ারের অভিযানের প্রায় ৫০ বছর পরে মুগীসূউদ্দীন য়ুজবক্‌ নূদীয়া ও তৎসন্নিহিত ভাগীরথী অববাহিকা অঞ্চল

অধিকার করেন এবং এই বিজয়ের স্মারক হিসাবে ১২৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়ার টাঁকশাল থেকে প্রস্তুত এক বিশেষ শ্রেণীর রজতমুদ্রার প্রচলন করেন। (Catalogue of Coins in the Indian Museum : Calcutta, Vol. II, Pt. II, p-146, No. 61)।

য়ুজবকের সময় থেকে হোসেন শাহের কাল অবধি নদীয়ার ইতিহাস বিশেষ স্পষ্ট নয়। দিল্লীর সুলতানদের শাসনকালে নদীয়া হয়ত তাঁদের রাজ্যভুক্ত ছিল। কোন কোন সময় বঙ্গের সুলতানরা স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও, সাধারণভাবে তাঁরা দিল্লীর সুলতানদের অধীনই ছিলেন।

বঙ্গের সুলতানী আমলের অত্যাচারী ও যথেচ্ছাচারী শাসক মুজাফ্ফর শাহের প্রধানমন্ত্রী, উদারহৃদয় পাঠান হুসেন শাহ বঙ্গ-সিংহাসন অধিকার ক'রে ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ভক্তপ্রাণ রূপ ও সনাতন ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন তাঁর মন্ত্রী। ইতোমধ্যে শান্তিপুরের অদূরে ফুলিয়ায় মহাকবি কৃত্তিবাস রচনা করেন তাঁর সপ্তকাণ্ড বাংলা রামায়ণ। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপে আবির্ভূত হন শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর প্রেমভক্তিধর্মের প্লাবনে সেদিন নদীয়া তথা বাংলার মানুষ যেন ঘুম ভেঙে এক নতুন ধর্মচেতনার জগতে জেগে উঠল। হিন্দুদের তো কথাই নেই, সে নবীন ধর্মাদর্শের আকর্ষণ অনুভব করলেন বামনপুকুরের চাঁদ কাজী, ফুলিয়ার যবন হরিদাস এবং রাজকুলের আরও শত শত ব্যক্তি। গড়ে উঠল নতুন সব বৈষ্ণবতীর্থ। এই আত্মিক বন্যার অভিঘাতে মনন ও জীবনচর্যার নানা ক্ষেত্র সক্রিয় হয়ে উঠল। সূত্রপাত হল ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনীসাহিত্য রচনার। "কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা একত্র বর্ণন"। গীতিসাহিত্যের খাতেও এল এক অভূতপূর্ব জোয়ার। নবদ্বীপ তখন বিদ্যানুশীলন ও উচ্চ চিন্তার কেন্দ্রভূমি ; বাংলার অক্সফোর্ড ; বেদ-বেদান্ত-জ্যোতিষ-তন্ত্র-ন্যায়-স্মৃতিচর্চার মহামহিমান্বিত সাধনপীঠ।

বাংলায় সুলতান আমলের পর শুরু হয় মোগলরাজত্ব। সে সময়ে তোডড়মল্ল সমগ্র বঙ্গদেশকে 'জরিপ জমাবন্দী ক'রে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে বাংলা ১৯টি 'সরকার' ও ৬৮৯টি 'মহল'-এ বিভক্ত হয়। নদীয়া তখন ছিল সপ্তগ্রাম সরকারের অধীন। এ সময়ে বাংলার কয়েকজন ভূস্বামী কার্যতঃ স্বাধীন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান বারোজনকে বলা হত দ্বাদশ ভৌমিক বা 'বারো ভূঁইয়া'। কথিত আছে, নদীয়ার ভূস্বামী, কুম্ভকারবংশীয় দেবপাল, মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে অসীম সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ভাগ্যদোষে সপরিবারে নিহত হন।

তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। দেবপালের নামানুসারে দেবগ্রামের নামকরণ হয়েছে ব'লেও শোনা যায়। ('পুরাকীর্তি পরিচিতি' অংশে 'দেবগ্রাম' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

নদীয়ায় আর একজন বীর ভূস্বামী ছিলেন কাশীনাথ রায়। 'নদীয়া কাহিনী' থেকে জানা যায়, চতুর্বেষ্টিত দুর্গস্বামী, কায়স্থকুলভূষণ, রাজা কাশীনাথ রায় মোগলদের পক্ষে পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধে অতুল বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

মোগলসম্রাট আকবরের শেষ জীবনে বাংলার 'বারো ভুঁইয়া'র অন্যতম যশোহররাজ প্রতাপাদিত্য মোগলের অধীনতা অস্বীকার করেন। সে সময়, অর্থাৎ ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে, নদীয়ার কিছু অংশ সম্ভবতঃ প্রতাপাদিত্যের শাসনাধীন ছিল। প্রতাপকে দমন করতে আসে ইসলাম খাঁর নেতৃত্বে এক শক্তিশালী মোগলবাহিনী। কৃষ্ণনগর থেকে ২০ মাইল (৩২·২ কি. মি.) দূরে, ভৈরব নদীতীরে বাগোয়ান গ্রামে (বর্তমানে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলায় অবস্থিত), মোগলবাহিনী শিবির সন্নিবেশ ক'রে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। প্রতাপাদিত্যের বাহিনী পরাজিত হতে থাকে। আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর দিল্লীর সম্রাট হয়ে অম্বররাজ সেনাপতি মানসিংহকে পাঠান প্রতাপকে দমনের জন্য। প্রতাপ তাঁর হাতে পরাজিত ও বন্দী হন এবং দিল্লীতে নীত হবার সময় পথিমধ্যে কাশীধামে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

বাগোয়ানে নদীয়ারাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের (পূর্বনাম—দুর্গাদাস সমাদ্দার) আদি বাড়ি ছিল। কুলজীগ্রন্থ অনুসারে, তিনি আদিশূর-আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম ভট্টনারায়ণের বংশধর। শোনা যায়, মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে ভবানন্দের সহায়তা লাভ করেন। পুরস্কারস্বরূপ, ভবানন্দ সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে বহু সম্মান লাভ করেন এবং ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের এক বাদশাহী ফরমানে নদীয়া, মহৎপুর, মারূপদহ, লেপা, সুলতানপুর; কাশিমপুর, বয়েড়া, মশুণ্ডা প্রভৃতি ১৪টি পরগণার অধিপতি হন। নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে, প্রতাপাদিত্যের পতনে মানসিংহকে সাহায্য ক'রে ভবানন্দের জমিদারী লাভের কথা মিথ্যা। জাহাঙ্গীর-প্রদত্ত ফরমান দু খানি (জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে, ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে, প্রদত্ত একটি ও ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত অপরটি) কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে চাক্ষুষ দেখে ভট্টশালী মহাশয় লিখেছেন যে, দুটি ফরমানের কোথাও প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে ভবানন্দের সাহায্যের উল্লেখ নেই (১৩৪৪ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত

একবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের কার্যবিবরণী গ্রন্থ ; পৃষ্ঠা ২৬২-৩)। নদীয়া রাজবাড়িতে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর, শাহ্জাহান ও আলমগীরের প্রদত্ত ফরমানগুলি রক্ষিত আছে।

ভবানন্দ বাগোয়ান থেকে মাটিয়ারীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ('পুরাকীর্তি পরিচিতি' অংশে 'মাটিয়ারী' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)। ভবানন্দ জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্তে মধ্যমপুত্র গোপালকে তাঁর জমিদারীর উত্তরাধিকারী করেন। গোপালও দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে লাভ করেন আরও কতকগুলি পরগণা। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বুদ্ধিবলে কয়েকটি পরগণার জমিদারী পান। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁর জমিদারী গোপালে বর্তায়। গোপালের কনিষ্ঠ পুত্র রাঘব রায় মাটিয়ারী থেকে রাজধানী তুলে আনেন রেউই নামক স্থানে। তিনি নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে পোড়ামাটির মূর্তি ও অলংকরণযুক্ত বেশ কয়েকটি বাংলা-রীতির মন্দির নির্মাণ করেন। তাঁর পুত্র রুদ্র রায় রেউই-এর নামকরণ করেন কৃষ্ণনগর। তিনি মোগল বাদশাহ্কে বার্ষিক কুড়ি লক্ষ টাকা কর দিতেন। শোনা যায়, রেউই তখন বৃক্ষাদিশোভিত মনোরম স্থান ছিল এবং বনে হরিণ ও ময়ূর বিচরণ করত। জনশ্রুতি, বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর কৃষ্ণনগরের অদূরে মৃগয়ার উদ্দেশ্যে শিবির সন্নিবেশ করেছিলেন। স্থানটি এখন জাহাঙ্গীরপুর নামে পরিচিত। এখানে 'বাগে রমনা' নামে একটি মনোরম বাগিচাও তিনি নাকি স্থাপন করেন। সেনাদল নিয়ে ক্লাইভ পলাশীতে যাবার পথে সেখানে বিশ্রাম করেছিলেন। পরে বাগানটি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে এলে তার নাম হয় 'কোম্পানীর বাগান'। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সেখানে ফলফলারি সম্পর্কে গবেষণার জন্য এক সরকারী কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। রুদ্রের প্রপৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র (১৭১০-১৭৮২) ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়ারাজ হন। তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী এবং সংস্কৃতি-পোষক। কবি ভারতচন্দ্র প্রমুখ জ্ঞানীগুণীরা তাঁর রাজসভা অলংকৃত করতেন। রাজা রাঘবের মত তিনিও নদীয়ায় বহুসংখ্যক মন্দির নির্মাণ করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে, এ জেলার অন্তর্গত পলাশীর আম্রকাননে, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জুন নবাব সিরাজউদ্দৌলা বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভের কাছে পরাজিত হলে বাংলার স্বাধীনতাসূর্য অস্ত যায়। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার দেওয়ানী লাভ করে। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য নদীয়ার কালেক্টার পদের সৃষ্টি হয় এবং একজন কালেক্টারের অধীনে, মোটামুটি বর্তমান আকারে (বাংলাদেশভুক্ত অংশ সহ), নদীয়া জেলা গঠিত

হয়। ইতোমধ্যে উইল ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায়, কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিষয়সম্পত্তি ও জমিদারী জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্রের নামে উইলপত্র ক'রে যান।

শিবচন্দ্র ১৭৮২ থেকে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ক্ষমতাসীন ছিলেন। পিতার ন্যায় বিদ্যা ও ধর্মে তাঁর অনুরাগ ছিল। তিনি বাংলার নবাবের কাছ থেকে 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি পান এবং সে উপাধি গভর্নর-জেনারেলও অনুমোদন করেন।

শিবচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র নদীয়ারাজ হন এবং ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ অবধি সে পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁর সময়ে, দশশালা বন্দোবস্ত অনুসারে, নদীয়ারাজের বার্ষিক রাজস্ব ধার্য হয় ৮,৫১,৫১২ টাকা। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির বর্তমান 'বিষ্ণুমহল' বা ঠাকুর-দালানটি তাঁর সময়েই নির্মিত।

ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র গিরিশচন্দ্র নদীয়ারাজ হলে রাজসম্পত্তি প্রথমে কোর্ট-অফ-ওয়ার্ডের অধীন হয়। তিনি ক্ষমতাসীন ছিলেন ১৮০২ থেকে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ অবধি। কৃষ্ণনগরে আনন্দময় ও আনন্দময়ী নামে, যথাক্রমে, শিবলিঙ্গ ও কালীমূর্তির দুটি মন্দির এবং নবদ্বীপে ভবতারণ ও ভবতারিণী নামে, যথাক্রমে, শিবলিঙ্গ ও কালীমূর্তির অপর দুটি মন্দির তাঁরই কীর্তি। তাঁর সময়েই কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী পূজা প্রবর্তিত হয়।

গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর দত্তকপুত্র শ্রীশচন্দ্র তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন ও ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ অবধি সে পদ অধিকার করেন। ভবানন্দ মজুমদার প্রতিষ্ঠিত নদীয়ারাজবংশের সাক্ষাৎ রক্তসম্বন্ধ গিরিশ-চন্দ্রেই শেষ হয়। শ্রীশচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মসভা স্থাপিত হয়। তিনি মকরসংক্রান্তিতে তন্ত্রোক্ত নীলদুর্গা পূজা প্রবর্তন করেন।

শ্রীশচন্দ্রের পর তাঁর পুত্র সতীশচন্দ্র ১৮৫৬ থেকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি নদীয়ারাজ ছিলেন। অপুত্রক অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হলে, সম্পত্তি আবার কোর্ট-অফ-ওয়ার্ডের অধীন হয়। তখন রাণী ভুবনেশ্বরী দেবী ক্ষিতীশচন্দ্রকে দত্তক গ্রহণ করেন। ক্ষিতীশচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে ১৮৯০ থেকে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নদীয়ারাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র ক্ষৌণীশচন্দ্র ১৯১১ থেকে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নদীয়ারাজ এবং কিছুদিন বঙ্গীয় সরকারের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র শ্রীসৌরীশচন্দ্র রায় এখন জীবিত।

পুরাকীর্তি এবং মন্দির-স্থাপত্য ও ভাস্কর্য : পলিমাটি-সমতল নদীয়া জেলায় আজ পর্যন্ত কোন সুপ্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি। বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া গিয়েছে পাল-সেনযুগের কিছু ভগ্ন বা অখণ্ড প্রস্তরমূর্তি, কয়েকটি পুরাতন ধাতুমূর্তি এবং সেনযুগের তাম্র-শাসন। বামনপুকুরের বল্লালঢিপি, সুবর্ণবিহার, শালিগ্রাম, বড়গাছি এবং দুই দেবগ্রামের ঢিপিগুলি উৎখনন করা হলে হয়ত প্রাচীন পুরাকীর্তির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

নদীয়ায় প্রাপ্ত পাল-সেনযুগের শিল্পশৈলী অনুসারে নির্মিত প্রস্তর ও ধাতুমূর্তিগুলি প্রথাগত শিল্পসুষমামণ্ডিত। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন যুগে নির্মিত মূর্তি সম্বন্ধে শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীন যুগ' গ্রন্থে যে মন্তব্য প্রকাশ করছেন তা উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন : "প্রস্তর ও ধাতুর মূর্তিনির্মাণ ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং অর্থশালী লোকই এই সমুদয় প্রতিষ্ঠা করতেন। শিল্পিগণও এই সম্প্রদায়ের আদেশে এবং শাস্ত্রানুশাসন ও লোকাচারের নির্দেশমত মূর্তি প্রস্তুত করতেন। এতে তাঁদের শিল্পরচনার শক্তি ও স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে খর্ব হত। বিশেষতঃ, এই শিল্পিগণ যাঁদের অনুগ্রহে জীবিকানির্বাহ করতেন, শিল্পের সৌন্দর্যবোধ অপেক্ষা ধর্মনিষ্ঠাই ছিল তাঁদের মনে অধিকতর প্রবল, সুতরাং বাংলার এই শিল্পিগণের পরিস্থিতি প্রকৃত শিল্পের উৎকর্ষের অনুকূল ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁরা যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য-বোধ ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের মধ্যে শিল্পের একটি সহজ ও স্বাভাবিক অনুভূতি ছিল। ধনী ও অভিজাতবর্গের অনুগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরিপুষ্ট এই সমুদয় শিল্পীর রচনা সমাজের উচ্চশ্রেণীর মনোরঞ্জন ও প্রয়োজনের অনুকূল হত।"

প্রস্তরমূর্তিগুলির অধিকাংশই বিভিন্ন ধরণের শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী দণ্ডায়মান বিষ্ণু (বাসুদেব) মূর্তি। তা ছাড়া, অল্প কিছু বুদ্ধমূর্তি বা বৌদ্ধপ্রভাবিত তারামূর্তিও আছে। এ অঞ্চলে বৌদ্ধপ্রাধান্যকালে, বিশেষতঃ পাল আমলে, সেগুলি নির্মিত হয়েছিল ব'লে অনুমিত হয়।

কৃষ্ণনগরে প্রাপ্ত খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে নির্মিত সদাশিবের একটি মূর্তি কৃষ্ণনগরের ৺রায় প্রসন্নকুমার বসু কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহশালায় দান করেন। মূর্তিটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৩'৮" এবং ১'৯" (১·১ মি. × ৫৪ সে.মি.)। কষ্টিপাথরে নির্মিত ত্রিমুখ ও দশভুজ এ মূর্তিটি পদ্মাসনে উপবিষ্ট। ডান দিকের পাঁচ হাতে অঙ্কুশ, ত্রিশূল, দণ্ড, বরাভয়মুদ্রা ও বরদমুদ্রা। বাম দিকের হাতে সর্প, ডমরু, পদ্ম,

অক্ষমালা ও পাত্র। পঞ্চরথ-বিন্যাসের পাদপীঠের উপর স্থাপিত মহাম্বুজের ঊর্ধ্বে মূর্তিটি অবস্থিত। বরদমুদ্রায় শ্রীবৎসচিহ্ন অঙ্কিত। ডান ও বামদিকের হাতের অলংকারগুলি পরস্পর পৃথক। মস্তকের ভঙ্গী প্রলয়ংকর। পাদপীঠে শিববাহন ষণ্ড। নীচে এক ভক্তের ক্ষুদ্র মূর্তি উৎকীর্ণ। পিছনে পর্ণাকৃতি জ্যোতির্বলয় ও চালিতে উড়ন্ত গন্ধর্বমূর্তি।

কৃষ্ণনগরের বাস্তুবিদ্ ৺চিত্তসুখ সান্যাল নারায়ণপালদেবের ৫৪ রাজ্যাঙ্কে উদ্দণ্ডপুরের জনৈক বণিক্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পিতলের এক পার্বতীমূর্তি কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহশালায় দান করেছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস'-এ (প্রথম ভাগ) মূর্তিটির পশ্চাদ্ভাগে উৎকীর্ণ লিপির নিম্নরূপ পাঠ আছে: "ওঁ দেয় (ধর্মে)য়ং শ্রীনারায়ণপাল দেবরাজ্যে সম্বৎ ৫৪, শ্রীউদণ্ডপু(র) বাস্তব্য রাণক উছপুত্র বারুকস্য।" স্বর্গত সান্যাল মহাশয়ের সংগ্রহের একটি প্রাচীন নৃসিংহমূর্তি কৃষ্ণনগরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের কাছে আছে। সেটির আকার ৫"×৩½" (১০ সে.মি.×৭ সে.মি.)। পদ্মাসীন, চতুর্ভুজ মূর্তিটির দু হাতে শঙ্খ, চক্র; অপর দু হাতে বরাভয়মুদ্রা। মুখাকৃতি নৃসিংহের। নীচে সর্প। একপাশে জোড়হাতে ভক্ত প্রহ্লাদ। পিছনে চালি। কোন ক্ষোদিত লিপি নেই।

নদীয়ায় প্রাপ্ত আরও কিছু প্রস্তর ও ধাতুর মূর্তি বিভিন্ন মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

নদীয়া জেলার কয়েকটি স্থান থেকে হিন্দু ও মুসলমান যুগের স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে এবং তার অধিকাংশই এখন বিভিন্ন সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। মুগীসূউদ্দীন য়ুজবকের সময়ে নদীয়ার টাঁকশালে যে মুদ্রা তৈরি হত সেকথা আগেই বলা হয়েছে। কিছু-সংখ্যক এই মুদ্রা কলকাতার ভারতীয় সংগ্রহশালায় আছে।

নদীয়ায় পাল-সেনযুগে নির্মিত কোন মন্দিরেরও সন্ধান পাওয়া যায়নি। তা হলে সে যুগে কি এ জেলা-এলাকায় কোন মন্দির নির্মিত হয়নি? হয়ত হয়েছিল। বিধ্বংসী জলবায়ু, প্লাবন, নদীর তটক্ষয় বা গতিপরিবর্তন এবং বখ্তিয়ার প্রমুখের ব্যাপক ধ্বংসলীলায় ইট বা পাথরের তৈরী সেসব ছোট ছোট মন্দির নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ব'লে অনুমিত হয়। শ্রীচৈতন্যজীবনীমূলক এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থাদিতে নদীয়ায় কোন মন্দিরের উল্লেখ না থাকায় অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রাচীনতর মন্দিরগুলি তার পূর্বেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

নদীয়ায় মুসলমান রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত কোন উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তির নিদর্শন পাওয়া যায় না। স্থানীয় ইতিহাসের সেই অন্ধকার যুগে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতি ছিল রুদ্ধ। পঞ্চদশ শতকের শেষে নদীয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) আবির্ভাবের ফলে জাতির জীবনে সুচিত হল এক নবজাগরণ। ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বিকশিত হতে লাগল নতুন উদ্দীপনায়। নবদ্বীপ তথা নদীয়াকে কেন্দ্র ক'রে নববৈষ্ণবধর্মের যুগান্তকারী অভ্যুদয়ের স্পর্শে সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি-স্থাপত্য-ভাস্কর্যে দেখা দিল যুগোপযোগী পরিবর্তন। সমৃদ্ধ হয়ে উঠল মন্দিরশিল্প এবং পোড়ামাটির ভাস্কর্য। নদীয়ার মন্দিরগুলি বাংলার নিজস্ব মন্দিরস্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত হলেও সেগুলি দেবস্থানমাত্র নয়, তারা নদীয়ার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রত্যক্ষ উপাদান।

বঙ্গদেশ তথা পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব মন্দিরস্থাপত্যরীতিকে পণ্ডিতেরা 'বাংলা-রীতি' নামে অভিহিত করেছেন। তাঁরা উত্তরভারত, বিশেষতঃ ওড়িশা থেকে আহৃত, 'নাগর'শৈলীর বিবর্তিত রূপ-অনুসারী 'দেউল'-রীতি ছাড়াও বাংলার নিজস্ব রীতিকে 'চালা', 'রত্ন' ও 'দালান' নামের প্রধান তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। বর্তমান সিরিজের প্রথম গ্রন্থ, শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি'-তে (পৃঃ ১১-২৬) এ প্রসঙ্গটি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে ব'লে বর্তমান পুস্তকে তার বিস্তারিত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবু এ গ্রন্থের স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিধানের জন্য বিষয়টি সংক্ষেপে বিবৃত হচ্ছে।

চালা-মন্দির : এ শ্রেণীতে দোচালা (বা একবাংলা), জোড়বাংলা, চারচালা, আটচালা, বারোচালা সবই পড়ে। রত্ন-মন্দির : এ পর্যায়ের দেবালয়শীর্ষে এক বা একাধিক চূড়া নির্মিত হয়। দালান-মন্দির : অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন, সমতল ছাদের এ দেবালয়গুলির সামনের অংশে সাধারণতঃ তিন বা ততোধিক খিলানযুক্ত প্রবেশপথ সহ অলিন্দ থাকে। নদীয়ায় এই তিন শ্রেণীর মন্দিরই দেখা যায় কিন্তু দেউল শ্রেণীর কোন দৃষ্টান্ত এখন নেই। আগেও ছিল কিনা বলা যায় না। চারচালা মন্দিরের সংখ্যাধিক্য এ জেলার এক উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য। কেননা, সংলগ্ন জেলাগুলিতে—হুগলী ও ২৪-পরগণায়—এ শ্রেণীর মন্দির বিরল। পাথরের মন্দির একটিও নেই, সবই চুন-সুরকির গাঁথুনিতে ইটের তৈরী।

বাঙালীর চিরকালের বাসগৃহ কুঁড়েঘরের সবচেয়ে সরল রূপ দোচালার আদলেই বঙ্গদেশের প্রথম পাকা মন্দিরগুলি নির্মিত

হয়েছিল। তার আগে বাঁশ-খড়-কাঠের তৈরী অনুরূপ দেবালয় হয়ত প্রচলিত ছিল। এ শৈলীর প্রধান লক্ষণ—চালার বাঁকানো শীর্ষ ও কার্নিস, যা যাবতীয় চালা-স্থাপত্যের ইমারতেই অল্পাধিক লক্ষ করা যায়। জোড়বাংলা-রীতিটি দোচালা বা একবাংলা-রীতিরই পরিবর্ধিত ও উন্নততর রূপ। ইমারতের অধিকতর স্থায়িত্বের জন্য দুটি দোচালাকে পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট ক'রে তাদের শীর্ষে কখনও এক সংযোগকারী চূড়া নির্মাণ করা হত, কখনও বা হত না। আটচালা-মন্দির চারচালারই পরিবর্ধিত রূপ। নীচের চারটি ঢালু চালের উপরে, অল্পাধিক উচ্চতার চারটি খাড়া দেওয়াল তুলে, তার উপরে দ্বিতীয় স্তরের আর চারটি অপেক্ষাকৃত ছোট আয়তনের চালা বিন্যস্ত করাই সেখানে রীতি। রত্ন-মন্দিরে চারিদিকের ঢালু ও বাঁকানো কার্নিসযুক্ত ছাদের কেন্দ্রে একটি চূড়া থাকলে তাকে বলা হয় একরত্ন, আর ছাদের চার কোণে যদি অতিরিক্ত চারটি চূড়া থাকে তবে তার নাম পঞ্চরত্ন। বস্তুতঃ, 'রত্ন' কথাটি এখানে চূড়ারই সমার্থক। কিন্তু সব রত্ন একই আয়তনের নয়। কেন্দ্রীয় চূড়াটি সব সময়েই কোণের চূড়াগুলি থেকে অল্পাধিক বড় হয়ে থাকে। পঞ্চরত্ন-মন্দিরের মাঝের চূড়াটির জায়গায় এক দোতলা কুঠরি বানিয়ে, তার ছাদের চার কোণে আর চারটি ছোট চূড়া ও মাঝখানে কেন্দ্রীয় চূড়াটি বসালে তৈরি হবে নবরত্ন-মন্দির। এইভাবে তলের সংখ্যা বাড়িয়ে অথবা প্রতি কোণে চূড়ার সংখ্যা একাধিক ক'রে নির্মিত পঞ্চবিংশতিরত্ন-মন্দির এখনও বেশ কিছু দেখা যায় হুগলী, বর্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায়। দালান-মন্দিরগুলি আর্য ও আর্যেতর ধর্মচিন্তা-মিশ্রণের ফলশ্রুতি। বাঁকানো-কার্নিসবর্জিত, সমতল ছাদের এ দেবালয়গুলি অনেক বেশী সাদাসিধে ব'লে, তাদের নির্মাণ-প্রকরণে যে উন্নত কারিগরির ব্যবহার হয়নি এমন নয়। এদের ফুলকাটা (পত্রাকৃতি) প্রবেশখিলানগুলি যেসব থামের উপর ন্যস্ত হত তাদের স্তম্ভগুচ্ছ বলাই সমীচীন। গোল ইটের চাকতি পরপর সাজিয়ে অনেকগুলি সরু থামের সমন্বয়ে সেগুলি তৈরি হত। এসব মন্দিরের খিলানশীর্ষ বা দেওয়াল অলংকরণের জন্য বহুক্ষেত্রে পদ্মের সজ্জা ব্যবহৃত হয়েছে।

নদীয়ার প্রাচীনতম মন্দিরটি পালপাড়ায় অবস্থিত ('পুরাকীর্তি পরিচিতি' পরিচ্ছেদে 'পালপাড়া' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য)। 'List of Ancient Monuments in Bengal' (Published by the Public Works Department, Govt. of Bengal, Revised and Corrected up to 31st August 1895; Calcutta-1896) গ্রন্থে এ দেবালয়টিকে

৫০০ বৎসরের প্রাচীন ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ চারচালা-মন্দিরটির ভিতরের ছাদ গম্বুজাকৃতি হওয়ার দরুন এটি যে মুসলিম-পরবর্তী কালের (অর্থাৎ ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের পূর্বে নয়) সেকথা নিশ্চিত। স্বর্গত ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন এটির নির্মাণকাল সতরো শতকের কোনও সময়ে ব'লে সিদ্ধান্ত করেছেন। ('Late Mediaeval Temples of Bengal.' p. 31)। আমরা এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত। সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাফলকহীন এ মন্দিরটি রাজা রাঘব রায় কর্তৃক নির্মিত হয়ে থাকতেও পারে। কেননা, ওই একই শতকের বিভিন্ন সময়ে তিনি দিগ্‌নগর, মাটিয়ারী ও শ্রীনগরে আরও কয়েকটি চারচালা-দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেগুলিও পালপাড়া মন্দিরের মত পোড়ামাটির অলংকরণসজ্জিত।

নদীয়ার অন্যান্য মন্দিরগুলি সপ্তদশ, অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকে নির্মিত। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়ারাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন ভবানন্দ মজুমদার। নদীয়ারাজেরা এবং অন্যান্য বিত্তশালী ব্যক্তিগণ এই মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠায় পোষকতা করেন। নদীয়ারাজদের মধ্যে সর্বাধিক-সংখ্যক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন রাঘব রায় (১৬১৮-১৬৬৯ খ্রীঃ) এবং নদীয়ার বর্তমান পোড়ামাটির ভাস্কর্যমণ্ডিত মন্দিরগুলির অধিকাংশই তাঁর সময়ে নির্মিত। রাঘব রায় তৎকালীন রাজধানী মাটিয়ারীতে একটি (১৬৬৫ খ্রীঃ), শ্রীনগরে একটি, দোগাছিতে একটি, শান্তিপুরে একটি (জলেশ্বর) এবং দিগ্‌নগরে দুটি (১৬৬৯ খ্রীঃ) চারচালা-শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছয়টি মন্দিরেরই পোড়ামাটির ভাস্কর্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। রাঘব রায় চাকদহ থানার মর্দানা গ্রামেও এক নগরীর পত্তন ক'রে তার নতুন নামকরণ করেন শ্রীনগর এবং সেখানেও রাজবাড়ি স্থাপন করেন। তিনি নবদ্বীপে গণেশ-মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ভাস্কর্যমণ্ডিত মন্দির নির্মাণ শুরু করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রুদ্র রায় সেটি সমাপ্ত করেন ('ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত': ৭ম পরিচ্ছেদ)। রাঘব রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলির আকার, গঠন ও অলংকরণের ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। সব মন্দির-গুলিই চারচালা, উচ্চতাও প্রায় এক এবং মোটামুটি একই ধরনের উন্নত মানের পোড়ামাটির ভাস্কর্য মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ। তবে পালপাড়া, জলেশ্বর (শান্তিপুর) ও দোগাছির মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলকগুলি অন্তর্হিত হওয়ায় তাদের সঠিক প্রতিষ্ঠাকাল জানা যায় না। বীরনগরে, ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে, কাশীশ্বর মিত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমন্দিরটিও চারচালা গড়নের ছিল। কিন্তু সেটি এখন বিধ্বস্ত।

নদীয়ায় বর্তমানে কোন দোচালা মন্দির নেই। ঘোড়াইক্ষেত্র (কালীগঞ্জ থানা) গ্রামে শ্যামরায় নামের কৃষ্ণবিগ্রহের মন্দিরটি নাকি দোচালা ছিল ব'লে শোনা যায়। সেটির প্রতিষ্ঠাকাল আনুমানিক ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে বা তার পূর্বে রাজা রাঘবের আমলেও হতে পারে। এটিতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পোড়ামাটির ভাস্কর্য ছিল, যার কিছু কিছু অবশেষ এখনও বর্তমান। ('পুরাকীর্তি পরিচিতি' পরিচ্ছেদে 'ঘোড়াইক্ষেত্র' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য)।

নদীয়ায় এখন মাত্র দুটি জোড়বাংলা-মন্দির আছে। বীরনগরে, ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে, রামেশ্বর মিত্র মুস্তৌফী বংশীধারী কৃষ্ণ ও রাধিকা বিগ্রহের জন্য একটি, ও তেহট্টে, ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, জনৈক রামদেব কৃষ্ণরায় নামের কৃষ্ণবিগ্রহের জন্য অপরটি নির্মাণ করেন। দুটি মন্দিরই পোড়ামাটির ভাস্কর্যমণ্ডিত।

নদীয়ায় আটচালা-মন্দির অনেকগুলি। তার মধ্যে প্রাচীনতম হল বাগআঁচড়ায় চাঁদ রায় প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির (১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দ)। বর্তমানে মন্দিরটি বিধ্বস্ত কিন্তু দীর্ঘ প্রতিষ্ঠালিপিটি প্রায় অক্ষত অবস্থায় কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। শোনা যায়, এখানে চাঁদ রায় নাকি মুখোমুখি চারটি আটচালা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখন অবশ্য একটি মন্দিরেরই ধ্বংসাবশেষ কোন গতিকে টিঁকে আছে। এ মন্দিরটিতে একদা উন্নত মানের পোড়ামাটির ভাস্কর্য বিদ্যমান ছিল। কামালপুরের মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলকটি প্রায় বিনষ্ট হওয়ায়, সঠিক প্রতিষ্ঠাকাল ও প্রতিষ্ঠাতার নাম জানা যায় না। মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির উৎকৃষ্ট মূর্তি ও কারুকার্যের দু চারটি এখনও অবশিষ্ট আছে। এ মন্দিরটি নদীয়ারাজ রাঘব রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিতও হয়ে থাকতে পারে। শান্তিপুরে হাটখোলাপাড়ায় মধ্যমগোস্বামীবাড়ির গোকুলচাঁদের এবং অদ্বৈতপ্রভুর আটচালা-মন্দির দুটিতেও পোড়ামাটির সুন্দর ভাস্কর্য আছে। এ দুটি মন্দিরেরও সঠিক প্রতিষ্ঠাকাল নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

এই আটচালা-মন্দিরগুলি ও পালপাড়ার চারচালা-মন্দিরটি সপ্তদশ শতকে বা তার কাছাকাছি সময়ে নির্মিত। তখন নদীয়ায় বহু দক্ষ কারিগর মন্দির-'টেরাকোটা'শিল্পে নিযুক্ত ছিলেন মনে হয়। সূক্ষ্ম পোড়ামাটির অলংকরণের বৈশিষ্ট্যগুলি এসব দেবালয়ে নিখুঁতভাবে রূপায়িত হয়েছে। সে বৈশিষ্ট্যের মূল সূত্র—সূক্ষ্মরেখামণ্ডিত প্রাণবন্ত মূর্তি, ঋজু ও বলিষ্ঠ শিল্পনৈপুণ্যের অভিব্যক্তি এবং, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, পাশ থেকে দেখানো 'বা-রিলিফ' ভাস্কর্য। তা ছাড়া জ্যামিতিক ও ফুলকারি নকশারও ব্যবহার হয়েছে অজস্র। বহুক্ষেত্রে মন্দিরের 'খিলান ও

প্রবেশদ্বারের দু পাশের ক্ষুদ্র স্তম্ভ দুটির সঙ্গে অনুরূপ মুসলিম কারুকৃতির মিল দেখা যায়। ডেভিড্ জে. ম্যাক্‌কাচ্চন মনে করেন, মুসলমান আমলের স্থাপত্য-ভাস্কর্য থেকে পরবর্তীকালের হিন্দু মন্দিরগুলি কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিল। ('বাংলার মন্দিরে পোড়ামাটির অলংকরণ' ঃ 'পশ্চিমবঙ্গ', ৭-৭-১৯৭২)।

অষ্টাদশ শতকে নদীয়ার পুরাকীর্তির ইতিহাসে সূচিত হয় এক নতুন অধ্যায়। স্থানীয়ভাবে এই শতাব্দী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভায় পুষ্ট বললে অত্যুক্তি হয় না। তাঁর রাজনৈতিক জীবন যাই হোক না কেন, জ্ঞান, বিদ্যা ও শিল্পচর্চার সকল ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন খাঁটি পৃষ্ঠপোষক এবং নূতনের সমর্থক। তাঁর সময়ে (১৭১০-১৭৮২ খ্রীঃ) নির্মিত বিভিন্ন মন্দিরের গঠনরীতিতে গতানুগতিকতাবর্জিত বৈশিষ্ট্যের জন্য তাকে 'কৃষ্ণচন্দ্রীয় মন্দির-স্থাপত্যরীতি' ব'লে চিহ্নিত করা চলে। আজকের দিনে কলকাতা-কালচার যেমন সারা পশ্চিমবাংলার কালচার, আঠারো শতকে কৃষ্ণনগর তথা নদীয়া-কালচার ছিল সারা বাংলার কালচার। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সে প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও, কৃষ্ণচন্দ্র-প্রবর্তিত মন্দিরস্থাপত্য-রীতি বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মন্দির-নির্মাতারা, এমন কি তাঁর বংশধররাও, পরে গ্রহণ করেননি। এর কারণ—প্রধানতঃ অর্থাভাব, যুগ-পরিবর্তন ও কারিগরি দক্ষতার হ্রাস।

এই নতুন শৈলীর প্রথম বৈশিষ্ট্য হল—মন্দিরের বৃহত্তর আকার। স্বভাবতঃই তার জন্য বহু অর্থ ব্যয় হত। সেকালের ধনকুবের বণিকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শান্তিপুরের শ্যামচাঁদ মন্দির (১৭২৬ খ্রীঃ) এবং কাঞ্চন-পল্লীর কৃষ্ণরায় মন্দির (১৭৮৬ খ্রীঃ) পূর্বতন আটচালা-শৈলীতে নির্মিত হলেও, সেগুলি আয়তনে পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম আটচালা-দেবালয়গুলির অন্যতম। আবার, মন্দির দুটিতে কিছু পদ্মের অনুকৃতি ছাড়া পোড়ামাটির অলংকরণ নেই বললেই চলে। পঙ্খের কারুকার্যও সামান্য। উভয় ক্ষেত্রেই সামনের আবৃত অলিন্দে পাঁচ-খিলানযুক্ত প্রবেশপথ বৃহদাকার স্তম্ভের উপর রক্ষিত—যার তুলনা নদীয়ার অন্য প্রাচীন বা পরবর্তী-কালের মন্দিরগুলিতে নেই।

কৃষ্ণচন্দ্রীয় শৈলীর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, চিরাচরিত বাংলা-মন্দিররীতি (যেমন চারচালা বা আটচালা) একেবারে পরিত্যক্ত না হলেও, সম্পূর্ণ নতুন আয়তন ও রূপ দেওয়া হয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি শিবনিবাসের মন্দিরগুলিতে। ('পুরাকীর্তি পরিচিতি' পরিচ্ছেদের 'শিবনিবাস' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।) তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, কৃষ্ণচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলিতে পোড়ামাটির

ভাস্কর্য হয় অনুপস্থিত নয়ত সংখ্যায় অতি সামান্য যদিও তখন নদীয়ায় মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পের অবনতির দশা শুরু হয়নি। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য, এ মন্দিরগুলিতে খিলান, মিনার প্রভৃতির সংযোজনে সমসাময়িক মুসলিম স্থাপত্যরীতির এমন কি 'গথিক' স্থাপত্যরীতিরও প্রতিফলন দেখা যায়।

কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র গিরীশচন্দ্র ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে আনন্দময়ী কালীমন্দির প্রতিষ্ঠাকালে কৃষ্ণচন্দ্রীয় রীতি অনুসরণ করেননি। সমতলছাদ দালানের উপর চারচালা-শিখরযুক্ত এই মন্দিরে সামান্য পঙ্খের অলংকরণ আছে। গিরীশচন্দ্র নবদ্বীপে ভবতারণ শিবের এবং ভবতারিণী কালীমূর্তির যে দুটি মন্দির স্থাপন করেন, তার মধ্যে ভবতারিণীর মন্দিরটি আনন্দময়ী মন্দিরের অনুরূপ।

নদীয়ায় অনেকগুলি রত্ন-মন্দিরের মধ্যে বীরনগরে ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত জগত্তারিণী ও দীনদয়াময়ী মন্দির দুটি নবচূড় বা ততোধিক চূড়াযুক্ত ছিল। রাণাঘাটের আর দুটি নবরত্ন-মন্দির সমতলছাদ দালানের উপর স্থাপিত এবং সেজন্য বাঁকানো-কার্নিসযুক্ত প্রাচীনতর রীতি-অনুসারী নয়। অন্যান্য বহুচূড়-মন্দিরের মধ্যে নবদ্বীপের বুড়োশিবের মন্দিরটি প্রাচীন। শ্রীমায়াপুরের বহুচূড় যোগপীঠ মন্দিরটি বর্তমান শতকে নির্মিত এবং নিতান্তই অর্বাচীন রীতির। পঞ্চচূড়-মন্দির সোনাডাঙায় একটি, শান্তিপুরে একটি, আঁইশমালীতে দুটি এবং বীরনগরে আছে চারটি। নদীয়ার কোন রত্ন-মন্দিরেই পোড়ামাটির ভাস্কর্য নেই তবে কোন কোন ক্ষেত্রে পঙ্খের অলংকরণ উৎকীর্ণ হয়েছে। এ মন্দিরগুলির চূড়া সব এক ধরণের নয়; কখনও ক্রমসূক্ষ্ম, কখনও বা স্থূল চূড়া দেখা যায়।

উনিশ শতকেও নদীয়ায় অনেকগুলি মন্দির নির্মিত হয়েছে। নদীয়ায় তখন পোড়ামাটির মন্দির-অলংকরণশিল্পের বেশ অবনতির দশা। সেজন্য রাণাঘাটে পালচৌধুরীদের দুটি এবং শান্তিপুরে কাঁসারীপাড়ায় আর দুটি সমকালীন আটচালা-শিবমন্দিরে পোড়ামাটির ভাস্কর্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নয়।

বাংলা-মন্দিরে 'টেরাকোটা'-সজ্জার উৎপত্তি, বিবর্তন ও অবনতি সম্পর্কে বর্তমান সিরিজের প্রথম পুস্তক 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি'তে গ্রন্থকার শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ব'লে (পৃঃ ১৭-২৬) এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সে গ্রন্থ থেকে শুধু নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিটিতে (পৃঃ-১৯) আমাদের বর্তমান

প্রয়োজন সিদ্ধ হবে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—"বাংলা-মন্দিরের 'টেরাকোটা'-সজ্জার বিস্তৃত সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে ছাঁচের ব্যবহার হলেও, খোদাই পদ্ধতিটিই সম্ভবতঃ বেশী প্রচলিত ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অল্পাধিক উচ্চতার 'বা-রিলিফ'-এর আকারে মূর্তি বা নকশাগুলিকে কাঁচা মাটির টালির উপর উৎকীর্ণ ক'রে তাদের চিরপ্রচলিত পোণ বা ভাটিতে পোড়ানো হত। ব্যবহৃত মাটিকে এ কাজের উপযোগী করতে বা পোড়ানোর সময় প্রয়োজনীয় আঁচের ব্যবস্থা করতে যে বিশেষ (ও সম্ভবতঃ গোপনীয়) ধরণের কারিগরির প্রয়োগ করা হত তাতে সন্দেহ নেই। লোনা ধ'রে ক্ষয়ে যেতে আজকের সাধারণ পোড়ামাটির ইটের লাগে বড় জোর তিরিশ-চল্লিশ বছর। কিন্তু 'টেরাকোটা'-অলংকরণগুলিকে অবাধ রৌদ্রবৃষ্টির মধ্যেও যখন দু তিন শ বছর কি তারও বেশী সময় অক্ষত থাকতে দেখি, তখন স্বভাবতঃই মনে হয় তাদের নির্মাণে নিশ্চয়ই উঁচু দরের দক্ষতা ও কলাকৌশল ব্যবহৃত হয়ে থাকবে।"

নদীয়ার (বীরনগরে) মাত্র দুটি মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলকে মিস্ত্রী বা কারিগরের নাম উল্লেখিত হয়েছে। দীনদয়াময়ী মন্দিরের কারিগর ছিলেন মিস্ত্রী তনু পণ্ডুয়া আর মাঝেরপাড়ায় হরচন্দ্র শর্মা প্রতিষ্ঠিত আটচালা-শিবমন্দিরের কারিগর ছিলেন সতাসরূপ (সত্যস্বরূপ ?) মিস্ত্রী। কৃষ্ণনগরসংলগ্ন ঘূর্ণী পল্লীর মৃৎশিল্পের দেশব্যাপী খ্যাতি প্রায় দু শ বছরের পুরাতন হলেও, নদীয়ায় মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পীদের কখনও কোন কেন্দ্র ছিল কিনা জানা যায় না।

বিভিন্ন মন্দিরে পোড়ামাটির ভাস্কর্যের প্রধান উপজীব্য কৃষ্ণলীলা, বিষ্ণুর দশাবতার, পৌরাণিক কাহিনী ও সামাজিক দৃশ্য। একমাত্র পালপাড়ার মন্দিরে রামায়ণের লঙ্কাযুদ্ধের দৃশ্য দেখা যায়। মহাভারতীয় কোন কাহিনীর ভাস্কর্যরূপ আরও বিরল। প্রবেশ-খিলানগুলির নিম্ন-প্রান্তে শিবলিঙ্গযুক্ত ছোট ছোট প্রতীক শিবালয় বহুক্ষেত্রে প্রথাগত অলংকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে—মন্দির-বিগ্রহ শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব যা-ই হোক না কেন। নদীয়ার দেবালয়গুলির অধিকাংশই শিবমন্দির, বাকীগুলি নামান্তরভেদে কৃষ্ণের মন্দির। সেগুলিতে মিথুন-ভাস্কর্য অল্পই উৎকীর্ণ হয়েছে। এজাতীয় সজ্জা দিগনগরের মন্দিরেই সর্বাধিক এবং সবচেয়ে অক্ষত। দোগাছির ভগ্ন মন্দিরেও কয়েকটির দেখা মেলে। কিন্তু শান্তিপুরের জলেশ্বর ও কামালপুরের মন্দিরে সেগুলি এত ক্ষয়িত যে ভাল ক'রে বোঝা যায় না।

সামাজিক ভাস্কর্যগুলির মধ্যে আছে রাজা, জমিদার বা ইউরোপীয়দের মৃগয়া অথবা ভ্রমণদৃশ্য ; প্রহরী, সৈন্যসামন্ত বা যুদ্ধযাত্রার দৃশ্য ; নৃত্য-বাদ্যসহযোগে 'বাবু'দের অবসর বিনোদনের দৃশ্য ; বাণিজ্যপোত, জলযুদ্ধ প্রভৃতি। তা ছাড়া, পশুপাখি ও হংসপঙ্‌ক্তি বহু মন্দিরে রূপায়িত হয়েছে। ফুললতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশাতেও উচ্চ নৈপুণ্যের পরিচয় মেলে।

পঙ্খের অলংকরণ প্রধানতঃ দালান-মন্দির ও ঠাকুর-দালানগুলিতেই নিবদ্ধ। কিন্তু কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির ঠাকুর-দালান ছাড়া অন্যত্র তাদের মান খুব উচ্চ শ্রেণীর নয়।

আনুমানিক সতরো শতকের প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠিত নদীয়ার প্রাচীনতম দরগাটি মাটিয়ারী গ্রামে (কৃষ্ণগঞ্জ থানা) অবস্থিত। সেটি হজরত সাউ মূল্‌কে গোজ বা 'বুড়ো সাহেবে'র দরগা নামে পরিচিত। হজরত সাউ নদীয়া-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের সমসাময়িক ছিলেন। সেখানে একটি প্রাচীন মসজিদও আছে ('পুরাকীর্তি পরিচিতি' অংশে 'মাটিয়ারী' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)। শান্তিপুরের তোপখানা মসজিদটিও প্রাচীন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষ দিকে, শান্তিপুরের তৎকালীন ফৌজদার গাজী মহম্মদ ইয়ার খাঁ মসজিদটি নির্মাণ করেন। ('পুরাকীর্তি পরিচিতি' পরিচ্ছেদে 'শান্তিপুর' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।) সাধুবাজারে (তেহট্ট থানা) পোড়ামাটি ও পঙ্খের অলংকরণযুক্ত আর একটি প্রাচীন মসজিদ আছে।

নদীয়ায় প্রথম গির্জা নির্মিত হয় ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ভবেরপাড়া গ্রামে (বাংলাদেশের 'মুজিবনগর'-এর অদূরে)। কৃষ্ণনগর শহরে প্রোটেস্টান্ট গির্জার নির্মাণ ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়ে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। গির্জার নকশা তৈরি করেন জনৈক ক্যাপ্টেন স্মিথ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ফাদার লইগী লিমানা কৃষ্ণনগরে আসেন এবং তিনি তখন যে বাড়িতে থাকতেন সেটিই পরে রোমান ক্যাথলিক গির্জায় পরিণত হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে বর্তমান রোমান ক্যাথিড্রাল গির্জাটি নির্মিত হয়।

কৃষ্ণনগর শহরে নদীয়ারাজ শ্রীশচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর্থিক দানে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরটি নির্মিত হয় ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে।

পুরাকীর্তি পরিচিতি

আইশমালী ঃ রাণাঘাট থানার অন্তর্গত এবং রাণাঘাট-বনগাঁ রেলপথের গাংনাপুর স্টেশন থেকে পাকা সড়কে ৬ মাইল (৯·৭ কি. মি.) দূরে অবস্থিত প্রাচীন গ্রাম। এখানে একই আকারের দুটি ছোট পঞ্চরত্ন-শিবমন্দির আছে। আয়তন বর্গাকার—১৬ ফুট × ১৬ ফুট (৪·৯ মি. × ৪·৯ মি.)। ত্রিশূলসহ উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুট (৯·২ মি.)। উভয় ক্ষেত্রেই মধ্যস্থলের সর্বোচ্চ চূড়াটি দেউল শ্রেণীর।

একটি মন্দির অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। পুবমুখী সে মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ আছে ঃ

"শকাব্দাঃ
১৭৫৯
৩১ বৈশাখ"

অর্থাৎ, মন্দিরটি ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত। এখানকার মুখোপাধ্যায়-বংশের যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন ব'লে জনশ্রুতি। উত্তর দিকেও দরজা আছে। কাঠের দরজায় খোদাই করা সামান্য অলংকরণ দেখা যায়। মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির কোনও অলংকরণ নেই; পঙ্খের নানাবিধ সজ্জা ও ফুলকারি নকশা আছে। গর্ভগৃহে কালো পাথরের শিবলিঙ্গ নিত্যপূজিত।

অলংকরণবিহীন অপর মন্দিরটি পরিত্যক্ত। কিন্তু তার দু দিকে প্রতিষ্ঠাফলক আছে। পশ্চিম দিকে শ্বেতপাথরের লিপিটি নিম্নরূপ ঃ

"রসখাষ্ট শশাঙ্কেস্মৃ পার্বতীচরণেন হি।
বন্দ্য বংশেন শব্বস্য মন্দিরোঽয়ং প্রতিষ্ঠিতঃ॥"

দক্ষিণ দিকে শ্বেতপাথরে ক্ষোদিত আছে ঃ

"বন্দ্যো বংশীয় ৺মদনমোহনের পুত্র
ভক্ত শ্রীপার্বতীচরণ
এই শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন।
সন ১২৯৪ সাল"

এখানে কয়েকটি প্রাচীন জীর্ণ অট্টালিকা এবং দালান-মন্দিরও দেখা যায়। এক সময় এখানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস ছিল। তাঁরা অনেকেই ছিলেন নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বৃত্তিভোগী। এই

গ্রাম সুরেশচন্দ্র সমাজপতির জন্মস্থান। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র ছিলেন। বিদ্যাসাগর এই গ্রামে তাঁর কন্যার বাড়িতে কয়েকবার এসেছিলেন ব'লে শোনা যায়।

আড়ংঘাটা: রাণাঘাট থানার অন্তর্গত এবং রাণাঘাট-গেদে রেলপথের আড়ংঘাটা রেল-স্টেশনসংলগ্ন গ্রাম। এখানে, স্বচ্ছসলিলা চূর্ণী নদীর তীরে, যুগলকিশোর বিগ্রহের এক দালান-মন্দির আছে। পাঁচটি ফুলকাটা খিলানের দুইটি সারিসংযুক্ত এত প্রশস্ত দালান-মন্দির পশ্চিমবাংলায় বিরল।

লোকশ্রুতি, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের হিন্দুস্থানী মহন্ত গঙ্গারাম দাস বৃন্দাবন থেকে কষ্টিপাথরে তৈরী শ্রীকৃষ্ণের এক কিশোরমূর্তি এনে নবদ্বীপের অনতিদূরে সমুদ্রগড়ে স্থাপন করেন। বর্গীর হাঙ্গামার সময় তিনি বিগ্রহটিকে নিয়ে আসেন আড়ংঘাটায়। সেখানে তাঁর স্বদেশবাসী বণিক্ রামপ্রসাদ পাঁড়ে তাঁকে আশ্রয় দেন। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় স্বপ্নাদেশে মৃত্তিকাগর্ভে একটি ধাতুনির্মিত রাধিকামূর্তি পান। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে আড়ংঘাটায় বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ ক'রে তিনি গঙ্গারামের শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ এবং তাঁর বাম পার্শ্বে তাঁর প্রাপ্ত রাধিকাবিগ্রহ স্থাপন করেন। কৃষ্ণচন্দ্রই এই যুগলমূর্তির নামকরণ করেন 'যুগলকিশোর' এবং তাঁর সেবার জন্য ১২৫ বিঘা দেবত্র ভূমি দান করেন।

শোনা যায়, একবার নাকি যুগলকিশোরের ধানের গোলা আগুন লেগে পুড়ে গেলে, রাণাঘাটের পালচৌধুরী-বংশের আদিপুরুষ কৃষ্ণপান্তি স্বল্পমূল্যে ঐ অগ্নিদগ্ধ গোলা ক্রয় করেন। আসলে ঐ গোলার উপরের দিকের সামান্য অংশই পুড়েছিল, নীচের ধানের বিশেষ ক্ষতি হয়নি। কৃষ্ণপান্তি ঐ ধান বিক্রী ক'রে প্রচুর অর্থ লাভ করেন এবং সেই সূচনা থেকে পরে বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হন।

প্রতিবছর সারা জ্যৈষ্ঠ মাস ধ'রে আড়ংঘাটায় যুগলকিশোরের মেলা বসে। এ অঞ্চলের মহিলাদের মধ্যে একটি বিশ্বাস প্রচলিত যে, জ্যৈষ্ঠ মাসে যুগলকিশোরকে দর্শন ক'রে পূজা দিলে বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। মেলায় তাই মেয়েদের ভিড় বেশী হয়।

যুগলকিশোর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই পূজিত রামপ্রসাদ পাঁড়ের গৃহদেবতা গোপীনাথ এখন যুগলকিশোর মন্দিরের দক্ষিণ দিকে আর একটি দালান-মন্দিরের উপাসিত।

আনুলিয়া: রাণাঘাট থানার অন্তর্গত এবং রাণাঘাট শহরের ২ মাইল (৩·২ কি. মি.) দক্ষিণ-পশ্চিমে চূর্ণীতীরবর্তী প্রাচীন গ্রাম। রাণাঘাট শহর থেকে রিক্শয় যাওয়া যায়।

বৌদ্ধযুগে এই গ্রাম বিদ্যমান ছিল। বৌদ্ধপ্রভাবিত নাম 'অনলগ্রাম' থেকে নাকি আমুলিয়া নামকরণ হয়েছে। জনশ্রুতি, বৌদ্ধ শ্রমণ শান্তাচার্য এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এখানকার লোকায়ত গ্রাম-দেবতা নাথপন্থীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ব'লে শোনা যায়। পাঠান আমলে এখানে নাকি এক ধনাগার ছিল। চূর্ণীতীরে একটি বিলীয়মান ঢিপি এখনও স্থানীয় লোকের কাছে 'ধনাগার' নামে পরিচিত। এই ঢিপি থেকে এক সময় নাকি কিছু স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল।

এখানে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয় এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সেটি ক্রয় করেন ('ঐতিহাসিক চিত্র' ; ১ম পর্যায় ; ১ম ভাগ ; পৃঃ ২৮৭-৯০)। কুমুদনাথ মল্লিককৃত 'নদীয়া কাহিনী'তে (২য় সং ; পৃঃ ১৭৭) তাম্রশাসনটির প্রতিলিপি মুদ্রিত আছে। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় (১৩৩৭ সাল ; ৩৭ ভাগ ; ৪র্থ সংখ্যা ; পৃঃ ২১৬), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (৩য় সং ; পৃঃ ৩৩৮, ৩৪৭), 'Inscriptions of Bengal, Vol. III, of Varendra Research Society, Rajsahi-3' এবং ক্ষিতিমোহন সেনকৃত 'চিন্ময় বঙ্গ' গ্রন্থেও তাম্রশাসনটির বিবরণ পাওয়া যায়। সেটির পাঠোদ্ধার থেকে জানা যায়, মহারাজ লক্ষ্মণসেন তাঁর তৃতীয় রাজ্যাঙ্কের ভাদ্র মাসের নবম দিবসে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী ব্যাঘ্রতটী গ্রাম কৌশিক গোত্রীয় যজুর্বেদীয় কাণ্বশাখাধ্যায়ী বিপ্রদাসের প্রপৌত্র শঙ্করের পৌত্র ও দেবীদাসের পুত্র রঘুদেব শর্মাকে প্রদান করেন। বাংলাদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ম সূত্রে জানা যায়, এই বহুমূল্য তাম্রশাসনটি বর্তমানে হারিয়ে গিয়েছে।

এখানকার আর একটি উল্লেখ্য পুরাবস্তু হল চূর্ণীতীরে প্রাপ্ত বিষ্ণুর এক প্রস্তরমূর্তি। এটির উচ্চতা ৪½ ফুট এবং প্রস্থ ২ ফুট ৩½ ইঞ্চি (১·৪ মি. × ৬৯ সে.মি.)। দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ মূর্তিটির বাম হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র এবং দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে গদা ও পদ্ম। মস্তকের দুই পার্শ্বে দুটি উড্ডীয়মান গন্ধর্বের ক্ষুদ্র মূর্তি এবং পাদদেশের দুই পার্শ্বে চামরব্যজনরতা দুটি নারীমূর্তি। মূর্তিটি স্থানীয় গ্রন্থাগারের কাছে এক বটতলায় এখন শিবরূপে পূজিত এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে সেটিকে কেন্দ্র ক'রে গাজন উৎসব হয়ে থাকে।

নদীয়ারাজের বংশধরেরা (ভবানন্দ মজুমদারের দ্বিতীয় পুত্র গোপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রের বংশধরেরা) এখানে বাস করেন।

আমঘাটা : কৃষ্ণনগর শহর থেকে ৫ মাইল (৮·১ কি.মি.) পশ্চিমে কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ পিচের সড়কের পাশে এবং কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ ছোট রেলপথের আমঘাটা স্টেশনসংলগ্ন গ্রাম।

নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র পরিণত বয়সে নিজ বাসের জন্য এখানে একটি সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই প্রাসাদের পাশ দিয়ে তখন অলকানন্দা নদী প্রবাহিত ছিল। অলকানন্দা জলঙ্গীর শাখানদী। গঙ্গাও বেশী দূরে ছিল না। সেজন্যই নাকি কৃষ্ণচন্দ্র এই প্রাসাদ ও গ্রামের নাম রাখেন গঙ্গাবাস এবং এখানেই তিনি ৭৩ বৎসর বয়সে, ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে, পরলোকগমন করেন। শুধুমাত্র ভগ্ন প্রাচীরের কিছু ছড়ানো ইট ছাড়া গঙ্গাবাস প্রাসাদের কোনও চিহ্ন আজ আর অবশিষ্ট নেই। অলকানন্দাও এখন মজে গেছে। অলকানন্দাতীরে কৃষ্ণচন্দ্র ১৬৯৮ শকে (১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে) যে পলস্তারা-আবৃত হরিহর মন্দিরটি নির্মাণ করেন তা এখনও বর্তমান। দেবালয়টির গড়ন অভিনব—সমতলছাদ এক দালানের উপর দুটি ছুঁচালো-শীর্ষ গম্বুজ স্থাপিত। হরিহরের যুগলমূর্তি অনুসারে এই যুগলশিখর। শিলাফলক থেকে জানা যায়, কৃষ্ণচন্দ্র হরি ও হরের অভেদ প্রতিপাদনের জন্য এই দেবগৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে, মৃত্তিকাসংলগ্ন পাদপীঠে নিবদ্ধ শিলাফলকটির লিপি নিম্নরূপ :

"গঙ্গাবাসে বিধিশ্রুত্যনুগতসুকৃতক্ষৌণিপালে শকেঽস্মিন্
শ্রীযুক্তো বাজপেয়ী ভুবি বিদিত মহারাজরাজেন্দ্রদেবঃ।
ভেত্তুং ভ্রান্তিং মুরারিত্রিপুরহরভিদামজ্ঞাতাং পামরাণাং
অদ্বৈতং ব্রহ্মরূপং হরিহরমুময়া স্থাপয়োল্লনয়া চ ॥"

অর্থাৎ, যেসব অজ্ঞ পামর শিব ও বিষ্ণুকে পৃথক ও উভয়ের মধ্যে ভেদ আছে মনে ক'রে পরস্পরকে বিদ্বেষ করে, তাদের ভ্রান্তি দূর করবার জন্য ভুবনবিখ্যাত বাজপেয়ী মহারাজেন্দ্রদেব (কৃষ্ণচন্দ্র) ১৬৯৮ শকে গঙ্গাবাসে এই মন্দির এবং হরিহরের ব্রহ্মরূপ অদ্বৈতমূর্তি লক্ষ্মী ও উমার সঙ্গে স্থাপন করলেন। এখানে 'বিধিশ্রুত্যনুগত'=৮, 'সুকৃত'=৯ এবং 'ক্ষৌণিপাল' (চাঁদের ষোল কলা)=১৬ এই অর্থ ধ'রে 'অঙ্কস্য বামাগতি' নিয়মে প্রতিষ্ঠাকাল দাঁড়ায় ১৬৯৮ শকাব্দ।

মন্দিরে হরিহরের চতুর্ভুজ প্রস্তরবিগ্রহ (একই বিগ্রহে হরি ও হর প্রকাশিত) প্রতিষ্ঠিত। মূর্তিটির বাম অংশ হরির; হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র। দক্ষিণ অংশ হরের; এক হাতে ত্রিশূল, অপর হাতে অভয়মুদ্রা। হরিহর এখনও নিত্যউপাসিত। ধ্যানমন্ত্রে তাঁর

অধিষ্ঠান ক'রে বীজমন্ত্রে পূজা ও নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। হরিহরের ধ্যান :

"শূলং চক্রং পাঞ্চজন্যমভীতিং দধতঃ করৈ।
স্ব স্ব ভূষাচ্ছলীলার্দ্ধদেহং হরিহরং ভজে॥"

মন্ত্র : "ওঁ হ্রীঁ হৌঁ শঙ্করনারায়ণায় নমঃ হৌঁ হ্রীঁ ওঁ।"

শোনা যায়, কৃষ্ণচন্দ্র বিপুল অর্থব্যয় ও পরিশ্রমে চিত্রকূট পর্বত থেকে শ্রীরামচন্দ্রের প্রস্তর-পদচিহ্ন এনে গঙ্গাবাসে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেটি এখনও বর্তমান। তবে অনেকে সেটিকে মহাবিষ্ণু গদাধরের পাদপদ্মও ব'লে থাকেন। গঙ্গাবাস সেজন্য হরিহরক্ষেত্র ও মহাবারাণসী নামেও পরিচিত।

কৃষ্ণচন্দ্র এখানে আরও ছয়টি দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। অন্নপূর্ণা ও মহালক্ষ্মীমূর্তি দুটি পূর্বে অষ্টধাতুর ছিল। সেগুলি চুরি যাওয়ায় এখনকার মূর্তি মাটির। এ ছাড়া, শীতলা, জগন্নাথ ও গণেশের মূর্তি এবং শালগ্রাম ও শিবলিঙ্গও আছে।

এখানে আর একটি ভগ্ন দেবালয় কালভৈরবের মন্দির নামে পরিচিত। সেখানে চতুর্ভুজ কালভৈরব, গণেশ ও হনুমানের প্রস্তর-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। কালভৈরবের বাঁ দিকের দু হাতের এক হাত সাপের ফণার নীচে মুষ্টিবদ্ধ, অপর হাত ফণার উপরে প্রসারিত ; ডান হাতে ত্রিশূল ও ডমরু। পিছনে কুকুর।

কৃষ্ণচন্দ্র হরিহরের পূজারী রাধাকান্ত তর্কবাগীশকে বিগ্রহের সেবাপূজার জন্য ২৯ শ্রাবণ ১১৬২ সালে ১০২ বিঘা নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করেন।

বর্তমান শতকের প্রথম দিকে, নদীয়ারাজ ক্ষিতীশচন্দ্রের সময়ে, গঙ্গাবাসের ভগ্নপ্রাসাদের স্তূপ থেকে চারটি কামান কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। গঙ্গাবাসের প্রাসাদ অদূরবর্তী প্রাচীন সুবর্ণবিহারের ('পুরাকীর্তি পরিচিতি' পরিচ্ছেদে 'সুবর্ণবিহার' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য) ইট-পাথর দিয়ে তৈরি হয়েছিল ব'লে শোনা যায়।

কাঞ্চনপল্লী : কাঁচড়াপাড়া রেল-স্টেশন থেকে ২ মাইল (৩.২ কি. মি.) পশ্চিমে, (সংযোগকারী পিচের রাস্তায় সাইকেল-রিক্শ চলে), কল্যাণী থানার অন্তর্গত কাঞ্চনপল্লী গ্রামে কৃষ্ণরায় বিগ্রহের দক্ষিণমুখী আটচালা-মন্দিরটি অবস্থিত। এটির প্রস্থচ্ছেদ আয়তাকার। দৈর্ঘ্যে ৪৯ ফুট ৬ ইঞ্চি (১৫.১ মি.), প্রস্থে ৩৩ ফুট ৬ ইঞ্চি (১০.৩ মি.) ও প্রায় ৬০ ফুট (১৮.৩ মি.) উচ্চতার এ দেবালয়টি পশ্চিম-

বঙ্গের বৃহত্তম আটচালা-মন্দিরগুলির অন্যতম। ভিত্তিবেদীর উচ্চতাও অসাধারণ—৬ ফুট ২ ইঞ্চি (১·৯ মি.)। ত্রিখিলানযুক্ত অলিন্দের পিছনে গর্ভগৃহ। সেখানে প্রবেশের প্রধান দরজার কাঠের কপাটে নানাবিধ পৌরাণিক নকশা ক্ষোদিত আছে। প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়, ১৭০৮ শকে (১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে) কলকাতার নিমাইচরণ ও গৌরচরণ মল্লিক ভ্রাতৃদ্বয় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের কৃষ্ণরায় বিগ্রহটি প্রাচীন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পারিষদ ছিলেন শিবানন্দ সেন, যাঁর উল্লেখ চৈতন্যজীবনীগুলিতে পাওয়া যায়। কাঞ্চনপল্লীতে তাঁর গৃহে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব এসেছিলেন। নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের অবস্থানকালে বাংলার ভক্তেরা প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময় তাঁকে দর্শন করতে সেখানে যেতেন। শিবানন্দ তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতেন ও যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতেন। কৃষ্ণরায় বিগ্রহ শিবানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাতপুত্র কচু রায় খ্রীষ্টীয় সতরো শতকের প্রথমে গঙ্গাতীরে কৃষ্ণরায়ের এক মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে সেটি গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হলে, বিগ্রহটি স্থানান্তরিত হয়ে বর্তমান মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়। দেবালয়টি চুনবালির পলস্তারা-আবৃত হলেও, সামনের দেওয়ালে ৬৬টি পোড়ামাটির পদ্ম উৎকীর্ণ আছে। গর্ভগৃহে সিংহাসনের উপর কৃষ্ণরায় বিগ্রহ আসীন : বিগ্রহের পদ্মাসনে উৎকীর্ণ লিপি ঃ

"স্বস্তি শ্রীকৃষ্ণদেবায় প্রাদুরাসীৎ স্বয়ং কলৌ।
অনুগ্রহায় দ্বিজঃ কিঞ্চিৎ শ্রিয়ঃ শ্রীনাথসংজ্ঞকঃ॥"

মন্দিরটি প্রাচীরবেষ্টিত বিস্তৃত প্রাঙ্গনের মধ্যে অবস্থিত। বিরাট সিংহদরজা ও নওবতখানা পেরিয়ে মন্দিরচত্বরে প্রবেশ করতে হয়। মন্দিরের কাছে, প্রাচীরের বাইরে, একটি আটচালা-দোলমঞ্চও আছে।

কামালপুর ঃ চাকদহ থানার অন্তর্গত, চাকদহ রেল-স্টেশন থেকে ৪ মাইল (৬·৪ কি.মি.) পুবে, চাকদহ-বনগাঁ পিচের রাস্তার ধারে অবস্থিত একদা-সমৃদ্ধিশালী প্রাচীন গ্রাম। চাকদহ থেকে রিক্‌শ চলে, বাসও যাতায়াত করে। গ্রামটির পূর্বতন নাম ভট্টাচার্য-কামালপুর।

এখানে এখন দুটি মন্দির বর্তমান। কামালপুর উচ্চবিদ্যালয়সংলগ্ন, বটবৃক্ষসমাচ্ছন্ন, জরাজীর্ণ মন্দিরটি প্রাচীন। পশ্চিমমুখী এ আটচালা-মন্দিরের দ্বিতল বহুদিন যাবৎ ভগ্ন। মন্দিরগাত্রে সামান্য কিছু পোড়ামাটির অলংকরণ আছে ; পূর্বে আরও বেশী ছিল বোঝা যায়। ইটে খোদাই করা দীর্ঘ এক লিপিফলক এ মন্দিরের বৈশিষ্ট্য। উত্তর ও দক্ষিণ

দিকের দেওয়ালের কার্নিসের নীচ বরাবর সে লিপিফলকের কিছু কিছু অংশ আজও দেখা যায়, কিন্তু পাঠোদ্ধার অসম্ভব। উত্তর দিকে প্রতিষ্ঠা-কালের উল্লেখ ছিল ব'লে অনুমিত হয়। ওই লিপিফলকের অংশ—"······শশাঙ্কসংখ্যবর্ষে হরিসদ্ম······" থেকে মনে হয়, একদা এটি এক বিষ্ণুমন্দির ছিল। পশ্চিমবাংলার মন্দিরে এহেন স্থানে লিপিবিন্যাস বিরল। মন্দিরের সম্মুখ অংশে অবশিষ্ট পোড়ামাটির মূর্তির মধ্যে আছে কালী, রাধাকৃষ্ণ, ও অন্যান্য দেবদেবী। বাম দিকের নীচের অংশে একটি মিথুন-ভাস্কর্য দেখা যায়। খিলানের উপরিভাগে এখন কোনও মূর্তি নেই, তবে লতাপাতা ও সূক্ষ্ম অলংকরণ আছে। মূর্তিগুলির কারিগরি বেশ সুন্দর। এ জীর্ণ দেবালয়টি সতরো শতকের শেষ দিকে বা আঠারো শতকের প্রথম ভাগে নির্মিত ব'লে মনে হয়।

এখানকার আর একটি প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন আটচালা-শিবমন্দির শতাধিক বৎসরের প্রাচীন হতে পারে। সেটির সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ পোড়ামাটির কিছু ফুল বা পদ্ম ছাড়া অন্য অলংকরণ নেই।

কামালপুর গ্রাম একদা ছিল পণ্ডিতপ্রধান। নদীয়ারাজের পোষকতায় এখানে এক বিদ্যাসমাজ গ'ড়ে উঠেছিল। ভারতবিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত রঘুদেব বাচস্পতি এখানকার গাঙ্গুলী-বংশের সন্তান। পণ্ডিত বনমালী বিদ্যাসাগরেরও জন্ম হয় এই গ্রামে। তাছাড়া, নব্য-ন্যায়ের আরও অনেক প্রখ্যাত পণ্ডিতের এখানে বাস ছিল। নদীয়া কালেক্টারীর বহুসংখ্যক তায়দাদে বিভিন্ন নদীয়ারাজ কর্তৃক এই গ্রামের পণ্ডিতদের বিদ্যাচর্চার জন্য নিষ্কর ভূমিদানের উল্লেখ আছে।

কুলিয়া ঃ কল্যাণী থানার অন্তর্গত এবং কাঁচড়াপাড়া রেল-স্টেশনের ৩ মাইল (৪·৮ কি. মি.) উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। কাঁচড়াপাড়া থেকে পিচের রাস্তায় রিক্‌শ ও মেলার সময় বাসও চলে। কুলিয়া বৈষ্ণব তীর্থ। এই স্থানকে অপরাধভঞ্জন বা কুলিয়ার পাটও বলা হয়। এখানকার মন্দিরে দারুনির্মিত গৌরনিতাই বিগ্রহ নিত্যউপাসিত। তা ছাড়া অষ্টধাতুর রাধিকা, কষ্টিপাথরের কৃষ্ণ ও শালগ্রামশিলা 'দামোদর'ও আছেন। গোস্বামী উপাধিধারী পুরোহিত-বংশ পুরুষানুক্রমে সেবাপূজায় নিযুক্ত। দক্ষিণমুখী মন্দিরটি দেউল শ্রেণীর—একটি সমতলছাদ দালানের উপর খাঁজকাটা দেউল-শিখর স্থাপিত। জনশ্রুতি, এক অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথিতে শ্রীচৈতন্যদেব কুলিয়ায় এসে এখানকার বৈষ্ণবনিন্দুক ও বৈষ্ণববিদ্বেষী দেবানন্দের অপরাধ মার্জনা করেন। সে কারণেই বৈষ্ণবদের কাছে শ্রীপাট কুলিয়া অপরাধভঞ্জনের

পাট নামে পরিচিত। মূল মন্দিরের পশ্চিমে, মজা নদী যমুনার তীরে, দেবানন্দ স্বামী ও চাপাল-গোপালের ছোট দুটি সমাধিমন্দির আছে। তার উত্তরে এক শিউলি গাছকে 'বাঞ্ছাকল্পতরু ষষ্ঠী' বলা হয়। সেই গাছতলায় ভক্তেরা এখনও 'অপরাধভঞ্জনে'র প্রতীক অনুষ্ঠান পালন ক'রে থাকেন। বৈষ্ণবদের বিশ্বাস, এখানে এসে গৌরনিতাই বিগ্রহ পূজা করলে সমস্ত পাপ ও অপরাধ দূর হয়। স্থানীয় 'দ্বাদশ বকুলকুঞ্জ' বৈষ্ণবদের কাছে অতি প্রিয়। কুলিয়ার পাটে প্রতিবছর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথিতে তিনদিনব্যাপী মেলা বসে। তখন বহু লোকের, বিশেষতঃ বৈষ্ণবদের, সমাগম হয়। তা ছাড়া, অপেক্ষাকৃত অল্প ধুমধামের সঙ্গে, দোল, রাস প্রভৃতি বৈষ্ণব উৎসবও পালিত হয়ে থাকে।

কৃষ্ণনগর ঃ নদীয়া জেলার সদর শহর। নদীয়ারাজের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের পৌত্র রাজা রাঘব রায় নবদ্বীপ-শান্তিপুর-কামালপুর-বিল্বপুষ্করিণী-বিল্বগ্রাম-বহিরগাছির পণ্ডিতসমাজের সান্নিধ্য-লাভের জন্য, তাঁর জমিদারীর প্রায় মাঝামাঝি স্থানে, জলঙ্গীতীরবর্তী রেউই গ্রামে, চতুর্দ্দিকে পরিখা বেষ্টন ক'রে এ রাজধানী স্থাপন করেন। রাঘবের পুত্র রাজা রুদ্র রায় রেউই-এর পরিবর্তে কৃষ্ণনগর নাম রাখেন। কারণ, তখন নাকি এখানে বহু কৃষ্ণোপাসক গোপ বাস করতেন।

রুদ্র রায়ের সময় তাঁর জমিদারী থেকে প্রভূত আয় হত। তিনি দিল্লীর বাদশাহ্‌কে বছরে ২০ লক্ষ টাকা কর দিতেন এবং কৃষ্ণনগরের রাজপ্রাসাদ, চক ও নওবতখানাদি নির্মাণ করেন। রাজবাড়ি, দরবারকক্ষ, বিষ্ণুমহল ও পূজামণ্ডপ প্রভৃতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজত্বকালে (১৭২৮-১৭৮২ খ্রীঃ) তৈরী। অবশ্য, পরবর্তী বিভিন্ন রাজাদের সময়ে সে সবের সংস্কার ও নবীকরণ হয়েছে।

প্রাচীরবেষ্টিত রাজবাড়ি এলাকার ভিতরে অবস্থিত সুবৃহৎ পূজা-মণ্ডপটি পঙ্খের অতি সুন্দর নকাশি অলংকরণে সজ্জিত। চৈত্র মাসের শুক্লা-একাদশী থেকে একমাসব্যাপী অনুষ্ঠিত বারোদোলের মেলার সময়, প্রথম তিন দিন নদীয়ারাজপূজিত তেরোটি কৃষ্ণরাধিকার বিগ্রহ বিভিন্ন স্থান থেকে এনে পূজামণ্ডপের পুব দিকে পুবমুখী তেরোটি দোলায় রাখা হয়। মূল পূজার স্থান বেশ বিস্তৃত এবং তার সামনে ও পিছনে পর পর দেউড়ি বা অলিন্দ। পশ্চিমবঙ্গে এত বড় এবং এত অলংকৃত পূজামণ্ডপ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। রাজবাড়ির মুসলিম-স্থাপত্যানুগ চারমিনারবিশিষ্ট তোরণপথটিও বিচিত্র ধরণের। সেটি পার হয়ে সামনেই

একটি বড় কামান দেখা যায়। তার পাদপীঠের লিপি: "Plassey Gun presented by Lord Clive, 1757." তা ছাড়া, অনেকগুলি ছোট কামানও আছে আশপাশে। জনশ্রুতি, পলাশীর যুদ্ধে ব্যবহৃত এসব কামান লর্ড ক্লাইভের কাছ থেকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র উপহার পেয়েছিলেন। এখানে ভবানন্দ মজুমদারকে জাহাঙ্গীর-প্রদত্ত দুটি বিরাট ধাতব ডঙ্কাও পড়ে আছে। আগে এই ডঙ্কা বাজিয়ে নাকি রাজাদেশ জারি করা হত।

কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে কৃষ্ণনগরের কর্মকারেরা কামান নির্মাণে সুদক্ষ ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে নির্মিত একটি কামান মুর্শিদাবাদের নবাব-প্রাসাদে আছে। সেটির নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1893) :

"It is some 3 feet in length and is of small bore 4 or 6 pounds. It has floral decoration. The head and the mouth are in the shape of a demon or a monster's head with long, pointed ears, a human face and a crocodile's jaws." কামানের গায়ে সংস্কৃত অক্ষরে লিখিত আছে—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে কিশোরদাস কর্মকার এই কামান নির্মাণ করেছেন এবং অক্ষর ক্ষোদিত করেছেন রূপরাম চট্টোপাধ্যায়।

কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র, তন্ত্রসাধক, মহারাজ গিরীশচন্দ্র রাজবাড়ির কাছে, দক্ষিণমুখী এক মন্দির নির্মাণ ক'রে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দময়ী কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সেজন্য সংলগ্ন এলাকার নাম আনন্দময়ীতলা। মূল চারচালা-মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২০ ফুট (৬·১ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০ ফুট (১২·২ মি.)। পরবর্তীকালে, তার পুব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে সমতল ছাদের ঢাকা দালান সংযোগ করা হয়েছে ব'লে মনে হয়। পলস্তারা-আবৃত এ দেবালয়ের সামনের দেওয়ালে সাধারণ কারিগরির কিছু পঙ্খের অলংকরণ দেখা যায়। আনন্দময়ীর মূর্তিটি বিচিত্র ধরণের। শয়ান মহাকালের উপর তিনি আসীনা। মন্দিরের পাদপীঠে নিবদ্ধ প্রস্তরলিপিটির পাঠ নিম্নরূপ :

"বেদাঙ্গেক্ষণগোত্রকৈরবকুলাধিপে শকে শ্রীযুতে
কৈলাসপ্রতিরূপকৃষ্ণনগরে শ্রীমদ্‌গিরীশোৎসবে।
নাম্নানন্দময়ী শুভেঽহনি মহামায়া মহাকালভৃৎ
রাজ্ঞা শ্রীলগিরীশচন্দ্র ধরণীপালেন সংস্থাপিতা॥"

অর্থাৎ, কৈলাসতুল্য কৃষ্ণনগরে শ্রীমান্ গিরীশের শুভ উৎসব দিনে ১৭২৬ শকাব্দে মহাকালধারিণী আনন্দময়ী নামে দেবী মহামায়াকে রাজা

গিরীশচন্দ্র স্থাপন করেন। এখানে 'বেদাঙ্গ'=৬, 'ঈক্ষণ' (চক্ষু)=২, 'গোত্র' (পর্বত)=৭ এবং 'কৈরবকুলাধিপ' (চন্দ্র)=১ ধ'রে, 'অঙ্কস্য বামাগতি' নিয়মে প্রতিষ্ঠাকাল ১৭২৬ শকাব্দ। 'গিরীশোৎসবে' কথাটিতে মহারাজ গিরীশচন্দ্রের অভিষেকোৎসব স্পষ্ট বোঝা না গেলেও, ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হবার সম্ভবতঃ দু বছর পরে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে (১৭২৬ শকাব্দে) তিনি এ দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিমে আনন্দময় শিবের মন্দির। তার পুব দিকে আরও দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট চারচালা-মন্দির আছে। সেগুলি অলংকরণহীন।

আনন্দময়ী মন্দিরের কাছে, ব্যবসায়ী জহরলাল দাশ প্রতিষ্ঠিত, ইটের তৈরী, পুবমুখী, এক চারচালা-শিবমন্দিরের সামনের খিলানের গায়ে কয়েকটি আটচালা-মন্দিরপ্রতীক দেখা যায়। অন্য অলংকরণ বা প্রতিষ্ঠাফলক নেই। তবে গঠনরীতি অনুযায়ী, মন্দিরটি আঠারো শতকের শেষে বা উনিশ শতকের প্রথমে নির্মিত ব'লে মনে হয়। মন্দিরের পাশে দুর্গামণ্ডপ ; সেখানে এখনও দুর্গাপূজা হয়ে থাকে। নাজিরাপাড়ায় আনন্দময়ী মন্দিরের অনুরূপ, শতাধিক বৎসরের প্রাচীন একটি দেবালয় আছে ; প্রতিষ্ঠাতা—মতিলাল সরকার। চৌধুরীপাড়ায় ইটের তৈরী চারটি চারচালা-শিবমন্দিরের মধ্যে একটি এখন বিধ্বস্ত। সে মন্দিরটিতে নাকি পোড়ামাটির সুন্দর কারুকার্য ও প্রতিষ্ঠাফলক ছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরের ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরটি নির্মিত হয়।

কৃষ্ণনগরে শতাধিক বৎসরের প্রাচীন কয়েকটি মসজিদ আছে। এখানকার প্রোটেস্টান্ট চার্চ (১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত) ও অপরূপ ভাস্কর্যমণ্ডিত রোমান ক্যাথলিক চার্চও আর এক শ্রেণীর পুরাকীর্তি। স্থানীয় বাস ষ্ট্যাণ্ডের দক্ষিণে, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের প্রাচীন গোরস্থানের কবরগুলিতে, শতাধিক বৎসরের প্রাচীন কিছু ফলক দেখা যায়। তা ছাড়া, কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও বিজ্ঞানী-শিক্ষক জগদানন্দ রায়ের বাস্তুভিটা, রবীন্দ্রস্মৃতিবিজড়িত 'রানীকুঠি' (প্রমথ চৌধুরীর পৈতৃক নিবাস) এবং অন্যান্য প্রাচীন ইমারতের মধ্যে কৃষ্ণনগর কলেজও (১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত) উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণী পল্লীর মৃৎশিল্প জগদ্‌বিখ্যাত। সেখানকার কয়েকজন খ্যাতনামা মৃৎশিল্পীর বংশধরদের কাছে শতাধিক বৎসরের প্রাচীন প্রশংসাপত্র ও পদকাদি আছে।

ঘোড়াইক্ষেত্র : কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত। শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথের দেবগ্রাম স্টেশন অথবা ৩৪ নং জাতীয় সড়ক থেকে কাঁচা

শাখাপথে ৫ মাইল (৮·১ কি. মি.) পশ্চিমে অবস্থিত। প্রাচীন নাম গোহরিক্ষেত্র। গ্রামটি এক সময় গঙ্গাতীরবর্তী ছিল; এখন গঙ্গা (ভাগীরথী) ১ মাইল (১·৬ কি. মি.) দূরে সরে গেছে।

এখানকার জমিদার দেবীদাস মুখোপাধ্যায় আনুমানিক ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে পোড়ামাটির মূর্তি ও অলংকরণযুক্ত একটি দোচালা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শ্যামরায় (বংশীধারী কৃষ্ণ) বিগ্রহের নাম অনুসারে মন্দিরটি শ্যামরায়ের মন্দির নামে পরিচিত ছিল। কালক্রমে সেটি লুপ্ত হলে, একই স্থানে একটি দালান-মন্দির নির্মিত হয়। বর্তমানে সেটিও ভগ্ন এবং পরিত্যক্ত। কিন্তু তার জীর্ণ দেওয়ালে পূর্বতন শ্যামরায় মন্দিরের পোড়ামাটির মূর্তি ও অলংকরণযুক্ত বেশ কয়েকটি টালি লাগানো আছে দেখা যায়। এগুলি থেকে মনে হয়, শ্যামরায়ের আদি দোচালা-মন্দিরটি একদা পোড়ামাটির অপরূপ ভাস্কর্যমণ্ডিত ছিল। শ্যামরায় বিগ্রহও এখন আর নেই, তবে শ্যামরায়ের নামে কিছু দেবোত্তর ভূসম্পত্তি এখনও আছে।

এখানকার লৌকিক দেবী 'বুড়ো-মা কালী' হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে পূজিতা। তাঁর কোন মন্দির নেই; মুখোপাধ্যায়বংশীয়দের নির্মিত সুন্দর বাঁধানো বেদীর উপর তিনি প্রতিষ্ঠিতা। তিনটি ১৪ ইঞ্চি × ৮ ইঞ্চি (৩৬ সে. মি. × ২০ সে. মি.) ডিম্বাকার শিলাখণ্ড লোকায়ত দেবতা ধর্মরাজ নামে এক মাটির দেওয়ালযুক্ত চালাঘরে উপাসিত। বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁদের বিশেষ পূজা হয়। গ্রামের অন্যত্র এক প্রাচীন বটগাছের নীচে ব্রহ্মাণীদেবীর থান ব্রহ্মাণীতলা নামে পরিচিত। শ্রাবণসংক্রান্তিতে সেখানে ব্রহ্মাণী (মনসা) পূজা হয় ও মেলা বসে। এই উৎসব উপলক্ষে বেদেরা সাপ নিয়ে এসে খেলা দেখায়। স্থানীয় কালীতলা 'উপপীঠ' হিসাবে পরিচিত। এক বটগাছের নীচে চালাঘরে রক্ষিত একটি গোলাকার প্রস্তরখণ্ডকে কালীরূপে পূজা করা হয়। ফরিদতলায় পীরপালশাহ্ ফকিরের নামে লোকে মানত করে, মাটির ঘোড়া ও শিরনি দেয়। এখানে নাকি একদা ইটের তৈরী এক ইমারত ছিল।

এই গ্রামে এক সময়ে পণ্ডিতদের বাস ছিল এবং শাস্ত্রচর্চাদি হত।

সংলগ্ন মন্থরাপুর গ্রামে, ভিত্তিবেদীর উপর স্থাপিত একটি উত্তরমুখী চারচালা-শিবমন্দির আছে। শিবলিঙ্গ নিত্যপূজিত। মন্দিরগাত্রে পঙ্খের সামান্য অলংকরণ দেখা যায়।

নিকটবর্তী বৈষ্ণবতীর্থ চাকুন্দী গ্রাম শ্রীনিবাস আচার্যের জন্মস্থান। এখানে তাঁর সমাধিও আছে। প্রাচীন গ্রামটি অবশ্য গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত

হয়েছে। শ্রীনিবাস আচার্যের শ্রীপাট এখন ভাগীরথীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। শ্রীচৈতন্যদেব এ গ্রামে এসেছিলেন। কার্তিকী গোষ্টাষ্টমী তিথিতে এখানে শ্রীনিবাসের তিরোভাব উৎসব পালিত হয়। স্থানীয় এক দালান-মন্দিরে কাঠের গৌরনিতাইমূর্তি শ্রীনিবাসের পিতা গঙ্গাধর ভট্টাচার্য বা শ্রীচৈতন্যদাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। একই মন্দিরে পাথরের বংশীধারী কৃষ্ণগোপীনাথ, পিতলের রাধারানী এবং ব্রোঞ্জ ও অন্য ধাতুনির্মিত ক্ষুদ্রাকার দুর্গা, নটরাজ, গণেশ ও গোপাল প্রভৃতির মূর্তিও আছে। দ্বিভুজা, পদ্মাসীনা, ধ্যানরতা, সুন্দর দুর্গামূর্তিটি বুদ্ধমূর্তির অনুরূপ, কিন্তু সেটি দুর্গামূর্তিরূপে পরিচিতা ও দুর্গাধ্যানে পূজিতা। নটরাজমূর্তিটিও সুন্দর।

অদূরের গোকুলনগর-বেগে গ্রামে বটগাছের তলায় পাথরের এক ষষ্ঠীমূর্তি ও একটি চালাঘরে কয়েকটি প্রস্তরখণ্ড ধর্মরাজরূপে পূজিত।

নিকটবর্তী হিজুলী গ্রামে রসিকরায় নামে পাথরের বেণুকৃষ্ণ ও অষ্টধাতুর রাধিকাবিগ্রহ আগেকার ইটের চারচালা-মন্দিরটি ধ্বংস হওয়ায় এখন একটি চালাঘরে প্রতিষ্ঠিত। সেখানে পিতলের বালগোপাল, কাঠের বানেশ্বর এবং শিবলিঙ্গও আছে।

ঘোড়াইক্ষেত্র থেকে কাঁচা রাস্তায় ২ মাইল (৩·২ কি. মি.) দূরে মাঝেরগ্রামে (নাকাশীপাড়া থানা) মজুমদারবংশীয়দের প্রতিষ্ঠিত পাশাপাশি তিনটি পশ্চিমমুখী আটচালা-শিবমন্দির আছে। প্রতিষ্ঠাকাল আনুমানিক ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দ। প্রতিটি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায়, যথাক্রমে, ১২ ফুট (৩·৭ মি.) ১২ ফুট (৩·৭ মি.) ও আনুমানিক ২০ ফুট (৬·১ মি.)। একদা সেগুলিতে পোড়ামাটির মূর্তি ও অলংকরণ ছিল ; কিন্তু সংস্কারের ফলে সেসব এখন নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

নিকটবর্তী মাটিয়ারী গ্রামে রামসীতার দালান-মন্দিরে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার পিতলের মূর্তি আছে।

ঘোষপাড়া : কল্যাণী থানার অন্তর্গত এবং কল্যাণী রেল-স্টেশনের ৪ মাইল (৬·৪ কি. মি.) পশ্চিমে অবস্থিত। সংযোগকারী পিচের রাস্তায় সাইকেল-রিক্‌শ ও মেলার সময় বাসও চলে।

ঘোষপাড়া বৈষ্ণবধর্মের উপশাখা কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র তথা পীঠস্থান। এখানে সে সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আউলচাঁদের (১৬৯৪-১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ) প্রথম ও প্রধান শিষ্য রামশরণ পালের বাস্তুভিটায়, এক ডালিম গাছের নীচে, রামশরণের ধর্মপ্রাণা স্ত্রী সিদ্ধিলাভ করেন ব'লে জনশ্রুতি। তিনি কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কাছে 'সতী-মা' নামে

পরিচিতা। শোনা যায়, আকারে ছোট হলেও ডালিম গাছটি নাকি 'সতী-মা'র সমকালীন। অদূরে, 'সতী-মা'র সমাধিমন্দিরে, তাঁর প্রতিকৃতি উপাসিত হয়। তাঁর ভিটার পিছনে 'হিমসাগর' দীঘির জলকে ভক্তেরা পবিত্র ও যাবতীয় রোগহর ব'লে মনে করেন। স্থানীয় আমবাগানে দোলপূর্ণিমার সময় সপ্তাহব্যাপী মেলা বসে। মেলায় কর্তাভজা ভক্তদের সমাবেশ হয়। এই প্রাচীন মেলাটি 'সতী-মা'র মেলা নামে পরিচিত। তা ছাড়া রথযাত্রা এবং রামশরণের পুত্র রামদুলালের মৃত্যুতিথিতেও এখানে মহোৎসব হয়ে থাকে। ভক্তদের কাছে ঘোষপাড়ার নাম 'নিত্যধাম'।

পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ থেকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত (ও অধুনা দুষ্প্রাপ্য) 'বাংলায় ভ্রমণ' নামক গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড: পৃঃ ৮১-৮৩) ঘোষপাড়া সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য ও কিংবদন্তী সন্নিবিষ্ট হয়েছে। "কর্তাভজাদের মধ্যে অনেকে বলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব পুরীধামে অন্তর্ধান করিবার পর, বহুকাল পরে পুনরায় আউলচাঁদরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া 'গুরু সত্য' এই মহামন্ত্র প্রচার করেন।...ইহাদের (কর্তাভজাদের) মতে কর্তা বা ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা এবং গুরুই ঈশ্বরের প্রতিনিধি। এই সম্প্রদায়ের গুরুগণ 'মহাশয়' ও শিষ্যগণ 'বরাতি' নামে অভিহিত হন। এই সম্প্রদায়ের সাধন বিষয়ে কতকগুলি গুহ্য রহস্য আছে, সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি ছাড়া অপরে উহা জানিতে পারেন না। দিনে পাঁচবার ইহাদের মন্ত্রজপ করিতে হয়। শুক্রবারকে পবিত্র জ্ঞানে এই দিন ইহারা উপবাসে ও ধর্মকর্মে অতিবাহিত করেন। মদ্য ও মাংস ইহাদের নিকট নিষিদ্ধ বলিয়া কথিত। সাধনক্ষেত্রে ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ না থাকিলেও ব্যবহারিক জীবনে ইহারা জাতিভেদ প্রথা মানিয়া চলেন। কথিত আছে যে, এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আউলচাঁদের ২২ জন শিষ্য ছিল। উহাদের মধ্যে সদ্গোপ বংশীয় রামশরণ পাল আউলচাঁদের মৃত্যুর পর গুরুর পদ প্রাপ্ত হন।...কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, একবার রামশরণের স্ত্রী ('সতী-মা') অত্যন্ত পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, আউলচাঁদ নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে কিছু মৃত্তিকা লইয়া তাঁহার গায়ে মাখাইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত ও সুস্থ করিয়াছিলেন। আউলচাঁদ তাঁহার সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া আশ্চর্যভাবে অন্তর্হিত হন। তিনিই রামশরণের পুত্র দুলালরূপে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া কথিত।...প্রবাদ যে, ইহার ('হিমসাগর' দীঘির) জল চোখে দিয়া জনৈক অন্ধ দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছিল।"

চাকদহ ঃ নদীয়া জেলার অন্যতম প্রাচীন স্থান। পূর্ব নাম চক্রদহ বা চক্রদ্বীপ। লোকশ্রুতি, মর্ত্যে গঙ্গা আনয়নের সময় ভগীরথের রথের চাকায় এখানে যে গভীর খাতের সৃষ্টি হয় তা পরে গঙ্গাজলে পূর্ণ হলে স্থানটির নাম হয় চক্রদহ বা, অপভ্রংশে, চাকদহ। এ কারণে স্থানটি পবিত্র। এক সময় চাকদহের গঙ্গায় স্নানের জন্য বহু দূরদেশ থেকে লোক সমাগম হত। শবদাহের জন্য এখনও অনেকে এখানে আসেন। গঙ্গাসাগরের মত চাকদহের গঙ্গায় শিশুসন্তান বিসর্জন দেওয়ার প্রথাও ছিল। কেউ কেউ আবার মোক্ষলাভকামনায় চাকদহের গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দিতেন। গঙ্গা এখন চাকদহ শহর থেকে অন্ততঃ ৪ মাইল (৬'৪ কি. মি.) পশ্চিমে সরে গেছে।

চাকদহ এলাকার প্রাচীন নাম প্রত্যুম্ননগর। প্রবাদ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রত্যুম্ন বঙ্গভূমের অধিপতি সম্বরাসুরকে নিধন ক'রে এ স্থানের নাম রাখেন প্রত্যুম্ননগর। তার আগে নাকি এ স্থানের নাম ছিল ঋক্ষবন্তনগর। আবার, 'ঘটককারিকা' অনুযায়ী, চাকদহের পুরাতন নাম আচম্বিতা। প্রাচীন দলিলাদিতে চাকদহের পূর্ব নাম প্রত্যুম্ননগর ও আচম্বিতার উল্লেখ আছে। প্রত্যুম্ন সম্বরাসুরকে চক্র দিয়ে বধ ক'রে এখানে তাঁর চক্র ধৌত করেন ব'লে এখানে এক দহের সৃষ্টি হয়। চক্রধৌতদহ থেকে চক্রদহ নামের উদ্ভব হয়েছে ব'লেও শোনা যায়।

যশোহর অভিযানের সময়, আকবরের সেনাপতি মানসিংহ প্রাকৃতিক দুর্যোগহেতু নাকি চাকদহে কয়েকদিন অবস্থান করেছিলেন।

চাকদহ শহরের কাঁঠালপুলি এলাকায় বৈষ্ণবদের দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম মহেশ পণ্ডিতের ফুলসমাজ, বেদী ও শ্রীপাট আছে। মহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব উপলক্ষে, অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথিতে এখানে বৈষ্ণবদের এক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

চাকদহ পৌরসভার প্রতিষ্ঠাতা জোসেফ ডেভিড মেলেক বেগলার ভারত সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের উচ্চ পদে আসীন ছিলেন। চাকদহে তাঁর বাড়িতে রক্ষিত পাথরের একটি বড় বুদ্ধমূর্তি পরে কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়মে স্থানান্তরিত হয়েছে। তিনি বুদ্ধগয়ায় খননকার্য চালিয়েছিলেন। মূর্তিটি সেখান থেকে আহৃত না চাকদহের কোথাও আবিষ্কৃত তা সঠিক জানা যায় না। [আনন্দবাজার পত্রিকায় (২৮ মাঘ ১৩৬১/১১ ফেব্রুআরি ১৯৫৫) প্রকাশিত সংবাদ ও চাকদহ বসন্তস্মৃতি পাঠাগার সূত্রে এই তথ্য সংগৃহীত]।

জুড়নপুর : কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত ও শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথের দেবগ্রাম স্টেশন থেকে (অথবা ৩৪ নং জাতীয় সড়কসংলগ্ন দেবগ্রাম থেকে) শাখাপথে ১১ মাইল (১৭'৭ কি. মি.) পশ্চিমে অবস্থিত।

সতীর মস্তিষ্কের অংশ, বা মতান্তরে, মুণ্ড পতিত হয়েছিল ব'লে জুড়নপুর প্রসিদ্ধ কালীতীর্থ ও স্থানীয়ভাবে 'পীঠ' হিসাবে পরিচিত। এখানকার কালীতলায় এক বাঁধানো বেদীতে সাধনা ক'রে রাজারাম সিদ্ধান্ত সিদ্ধিলাভ করেন। জনশ্রুতি, স্বয়ং মা কালী রাজারামের স্ত্রীরূপে এসেছিলেন। মাঘী পূর্ণিমার রাত্রে রাজারামের স্ত্রী দেহরক্ষা করেন। সেজন্য প্রতিবছর ওই তিথিতে স্থানীয় কালীবাড়িতে মেলা বসে। নিঃসন্তান রাজারামের অগ্রজ নৃসিংহ তর্কবাগীশের বংশধরেরা নিকটবর্তী হরিনাথপুরে দ্বীপান্বিতার রাত্রে কালীপূজা ক'রে থাকেন। তাঁদের কালী 'বুড়ো-মা' নামে পরিচিতা। হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকলেই তাঁর কাছে মানত করে ও বলি দেয়। নাটোররাজ রামকৃষ্ণ এবং সাধক তারাক্ষেপা এখানে কিছুকাল তপস্যা করেছিলেন ব'লে শোনা যায়। এখানে পাথরের এক মনসামূর্তিও আছে। ললিতাসনে আসীনা মূর্তিটির মাথার উপর সপ্তফণাবিশিষ্ট নাগ, ডান হাতে শঙ্খ ও বাঁ হাতে সাপ।

তেহট্ট : তেহট্ট থানার অন্তর্গত এবং কৃষ্ণনগর থেকে বাসপথে ২৭ মাইল (৪৩'৫ কি. মি.) উত্তরে অবস্থিত। প্রাচীন নাম ত্রিহট্ট। এক সময় এ অঞ্চলের তিনটি স্থানে সপ্তাহে দু দিন ক'রে হাট বসত। পরে, জলঙ্গী নদীর পূর্বতীরে এক প্রশস্ত জায়গায় তিনটি হাট একত্র হয়ে বসতে শুরু করলে, সে স্থানের নাম হয় ত্রিহট্ট; অপভ্রংশে, তেহট্ট।

তেহট্টের ঠাকুরপাড়ায় কৃষ্ণরায় বিগ্রহের জোড়বাংলা-মন্দিরটি নদীয়া জেলার অল্পসংখ্যক জোড়বাংলা 'টেরাকোটা'-মন্দিরের অন্যতম। এ দেবালয়ের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে পোড়ামাটির হরফে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠা-লিপিটির পাঠ নিম্নরূপ :

> "১৬০০ শাকে শূন্যনভঃষড়িন্দুগণিতে মেষগতে ভাস্করে
> শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দনিরতঃ শ্রীরামদেব মহান
> লক্ষ্মী যস্য পদারবিন্দসেবনবিধৌ ব্যাপারসম্পাদিনী
> তস্য শ্রীপুরুষোত্তমস্য চ গৃহং যত্নৈরকার্ষীত্ স্বয়ং॥"

অর্থাৎ ১৬০০ শকাব্দের (১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দের) বৈশাখ মাসে শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মসেবী মহান পুরুষ রামদেব, লক্ষ্মীদেবী যাঁর পদসেবা

করেন তাঁর উপাসনার জন্য, যন্ত্রের সঙ্গে শ্রীপুরুষোত্তমের এ মন্দির নির্মাণ করেন। এখানে 'শূন্য' = ০, 'নভঃ' = ০, 'ষড়' = ৬ এবং 'ইন্দু' = ১ ধ'রে 'অঙ্কের বামাগতি' নিয়ম অনুসারে প্রতিষ্ঠাকাল ১৬০০ শকাব্দ।

নদীয়ারাজ রুদ্র রায়ের সময়ে দেবগৃহটি নির্মিত। এখানকার কৃষ্ণরায় বিগ্রহ বারোদোলের সময় কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর ক্ষুদ্র মূর্তিটি কষ্টিপাথরের। মন্দিরে রাধিকা নেই। কিছু শালগ্রামশিলা আছে। রাধিকাবিহীন কৃষ্ণমূর্তি, বীরভূম জেলার বীরসিংহপুর বা অন্যত্র থাকলেও, পশ্চিমবঙ্গে বেশ বিরল।

ইটের তৈরি জোড়বাংলা-মন্দিরটি পশ্চিমমুখী। সামনের দেওয়ালে একদা পোড়ামাটির প্রচুর মূর্তি ও অলংকরণ ছিল। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ সংস্কারের ফলে, এখন সেখানে চুনবালির পলস্তারা। পিছনের দোচালায় গর্ভগৃহে যাবার প্রবেশপথের উপরে পোড়ামাটির সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখা যায়। তার মধ্যে উল্লেখ্য চারটি মূর্তির দুটি চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ এবং অপর দুটি রাজমূর্তি। খিলানের প্রান্তে মোট ১৪টি আটচালা প্রতীক-শিবমন্দির; তাদের বেষ্টন ক'রে ১২টি বাতিদান ও মেঝের অনুভূমিক হংসপঙ্‌ক্তি দেখা যায়। এ ছাড়া, ফুললতাপাতার কিছু নকাশি কাজও আছে। অনুমান হয়, এজাতীয় পোড়ামাটির সজ্জা একদা সামনের দেওয়ালেও ছিল।

কৃষ্ণরায়কে কেন্দ্র ক'রে স্থানীয় অনেক লোককাহিনী প্রচলিত। এখানকার চাতরপাড়া প্রাচীনত্বে খ্যাত। সেখানে, এক বিস্তীর্ণ স্থানে, হরিনাম, সঙ্কীর্তন, পূজা, যাগযজ্ঞ ও হোমাদি হত। এসব কাজে ব্যবহৃত 'চত্বর' থেকে চাতরপাড়া নাম হয়েছে মনে হয়। স্থানীয় দোলমন্দিরটি বর্তমানে প্রায় নিশ্চিহ্ন। বৈষ্ণবদের এককালীন প্রখ্যাত আখড়া এবং সাধনপীঠ চাতর এখন অতীতের নীরব সাক্ষী মাত্র।

দিগ্‌নগর: কোতোয়ালী (কৃষ্ণনগর) থানার অন্তর্গত এবং কৃষ্ণনগর থেকে ৭ মাইল (১১·৩ কি. মি.) দক্ষিণে, ৩৪ নং জাতীয় সড়কসংলগ্ন প্রাচীন গ্রাম। পূর্ব নাম দীর্ঘিকানগর থেকে কথ্যভাষায় বিবর্তিত নাম দিগ্‌নগর।

নদীয়ারাজ-প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের পৌত্র রাজা রাঘব রায় মাটিয়ারী থেকে রেউই-এ (বর্তমান কৃষ্ণনগর) রাজধানী স্থানান্তরিত করবার পর, কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী এক সড়ক তৈরি করেন এবং জনসাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য সে পথের ধারে কুড়ি হাজার টাকা ব্যয়ে এক বিশাল দীঘি খনন করেন। দীঘিটি

দৈর্ঘ্যে ৭২৬ গজ (৬৬৩·১ মি.) ও প্রস্থে ২১০ গজ (১৯১·১ মি.)। দীঘি থেকে স্থানের নাম হয় দীর্ঘিকানগর।

দীঘির পুব দিকে রাজা রাঘব এক সুন্দর অট্টালিকা এবং কাছাকাছি দুটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। একটি মন্দির বর্তমানে জীর্ণ; অপরটি অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় আছে এবং সেখানে 'রাঘবেশ্বর' শিবলিঙ্গের নিত্যপূজা হয়। দ্বিতীয় দেবালয়টি পশ্চিমমুখী, চারচালা, এবং দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৯ ফুট ১০ ইঞ্চি (৬·১ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফুট (৯·২ মি.)। সামনের দেওয়ালে, বাঁকানো কার্নিসের নীচে নিবদ্ধ 'স্লেট্'-পাথরে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ :

"১৫৯১ ॥ শাকে সোমনবেষুচন্দ্রগণিতে পুণ্যৈক
রত্নাকরো ধীরশ্রীযুতরাঘবো দ্বিজমণি
ভূমীভুজামগ্রণীঃ ॥ নির্মায় স্ফুরদূর্ম্মিনির্ম্মল
জলপ্রদ্যোতিনীন্দীর্ঘিকান্তত্তীরে
কৃতরম্যবেশ্মনি শিবন্দেবং সমস্থাপয়ত্ ॥"

অর্থাৎ ১৫৯১ শকাব্দে (১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে) পবিত্র রত্নাকরসদৃশ, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ভূমিপালদের প্রধান ও ধীরস্বভাব শ্রীযুত রাঘব স্বচ্ছতরঙ্গমালা ও নির্মল জলের দ্বারা সমুজ্জ্বল দীঘি খনন ক'রে তার তীরে সুরম্য মন্দিরে শিবকে প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে 'সোম'=১, 'নব'=৯, 'ইষু' (বাণ)=৫ এবং 'চন্দ্র'=১ ধ'রে 'অঙ্কের বামাগতি' নিয়ম অনুযায়ী প্রতিষ্ঠাকাল ১৫৯১ শকাব্দ।

এ দেবালয়ে 'টেরাকোটা'-অলংকরণগুলি প্রধানতঃ পশ্চিম ও দক্ষিণের দেওয়ালে উৎকীর্ণ। পুবের দেওয়ালে কিছু পোড়ামাটির পদ্ম ছাড়া অন্য সজ্জা নেই। উত্তরের দেওয়াল পলস্তারা-আবৃত। সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ ভাস্কর্য ও ফুলকারি নকশাগুলির অবস্থান বহুলাংশে প্রথাগত। ভিত্তিবেদীর সংলগ্ন দুটি অনুভূমিক সারিতে পালকিবাহিত বাবু, অশ্বারোহী শিকারী, হাঁতি ও উটের পিঠে সওয়ার, মিথুনদৃশ্য প্রভৃতি সমাজচিত্র উৎকীর্ণ আছে। তার উপরের সারিতে একটানা হংসপঙ্ক্তি। প্রবেশপথের উপরে ও দু পাশে কুলঙ্গিতে নিবদ্ধ দুই সারি মূর্তির মধ্যে দশাবতার, কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য, যথা কৃষ্ণরাধিকা, বস্ত্রহরণ, কালীয়দমন প্রভৃতিই প্রধান। তাদের দু পাশে, দেওয়ালের প্রান্ত অবধি বিন্যস্ত, রাম, বলরাম, বৃষবাহন শিব, শালভঞ্জিকা, প্রহরী, সৈনিক, সন্ন্যাসী প্রভৃতি বিবিধ মূর্তির সমারোহ। ফুলকাটা প্রবেশ-খিলানের শীর্ষে প্রথাগত লঙ্কাযুদ্ধের পরিবর্তে অতি সূক্ষ্ম ফুলকারি নকশার

প্রয়োগ এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। একই সৌকর্যের ফুলকারি নকশা দেওয়ালের অন্যত্রও (এবং শান্তিপুরের 'জলেশ্বর' মন্দিরে) উৎকীর্ণ হয়েছে। পশ্চিমের প্রধান প্রবেশপথের খিলানের প্রান্তে বহুসংখ্যক ছোট ছোট প্রতীক চারচালা-শিবমন্দির ও দক্ষিণ দিকের রুদ্ধদ্বার খিলানের উপর অনুরূপ প্রতীক রথীমূর্তি দেখা যায়। দক্ষিণের দেওয়ালে ভাস্কর্যের অবস্থান মোটামুটি পশ্চিমের দেওয়ালের মতই। দু দিকেই কিছু মিথুনদৃশ্য আছে যা নদীয়ার অন্যত্র বেশী নেই। প্রধান এবং দক্ষিণ দিকের (বন্ধ) প্রবেশপথের নীচের চৌকাঠ হিসাবে গুরুভার দুটি কালো পাথরের ব্যবহারও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। গর্ভগৃহের চার কোণে লহরার বিন্যাস ক'রে তার উপর গম্বুজাকৃতি ভিতরের ছাদ স্থাপিত হয়েছে। গর্ভগৃহে রক্ষিত প্রায় ২ ফুট (৬১ সে. মি.) উচ্চতার কষ্টিপাথরের বাসুদেবমূর্তিটিও লক্ষণীয়। কেননা, এজাতীয় সুন্দর পাল-ভাস্কর্য নদীয়া জেলায় বিরল। এটি কোথা থেকে বা কখন সংগৃহীত হয়েছিল জানা যায় না।

মূল মন্দিরের সন্নিহিত দক্ষিণ-পশ্চিমে, বিগ্রহ ও প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন, উত্তরমুখী, জীর্ণ দেবালয়টির উর্ধ্বাংশ এখন সম্পূর্ণ ভগ্ন হলেও, সেটি চারচালা শ্রেণীর ছিল ব'লেই মনে হয়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭ ফুট ৬ ইঞ্চি (৫·৪ মি.), এ মন্দিরের উচ্চতা ছিল আনুমানিক ৩০ ফুট (৯·২ মি.)। উত্তর ও পুব দেওয়ালে নিবদ্ধ 'টেরাকোটা'-মূর্তি ও নকাশি কাজগুলির অবস্থান এবং বিষয়বস্তু প্রধান মন্দিরের অনুরূপ হলেও, বর্তমানে সেগুলি খুবই ক্ষয়িত। রাজা রাঘব রায় সম্ভবতঃ এই মন্দির দুটি একই সময়ে নির্মাণ করিয়েছিলেন।

রাঘবেশ্বর মন্দিরের সামনের কাঁচা রাস্তা ধ'রে কিছুটা উত্তরে গেলে, আদিপাড়ায়, পথের পাশেই, পশ্চিমমুখী আর একটি চারচালা-শিবমন্দিরের দেখা মেলে। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২ ফুট ৩ ইঞ্চি (৩·৮ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফুট (৭·৬ মি.), এ দেবালয়ে কোন প্রতিষ্ঠালিপি বা বিগ্রহ নেই; অবস্থাও বেশ জীর্ণ। আনুমানিক দেড় শ বছরের প্রাচীন এ মন্দিরের সামনের দেওয়ালে চুনবালির কিছু সাধারণ অলঙ্করণ আছে। বাইরের চারচালা ছাদ ভিতরের লহরানির্ভর গম্বুজাকৃতি ছাদের উপর স্থাপিত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও রাণাঘাটের পালচৌধুরীদের অধীনস্থ পত্তনীদার চক্রবর্তী-পরিবার এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁদের ভদ্রাসনের ভগ্নাবশেষ অদূরেই দেখা যায়।

এখানকার 'কল্পতরুবৃক্ষ'তল বৈষ্ণবদের কাছে পবিত্র স্থান। শ্রীমৎ রাধারমণ চরণদাস বাবাজীর স্মারক একটি বটগাছ ও তাঁর সমাধি এখানে অবস্থিত। চৈত্র মাসের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে সেখানে 'কল্পতরুবৃক্ষরাজ উৎসব' পালিত হয়।

দিগ্‌নগর রবীন্দ্রস্মৃতিবিজড়িত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ভগিনী সৌদামিনীর সঙ্গে এখানকার যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। ঠাকুরবাড়িতে বিবাহ হওয়ার জন্য যাদবচন্দ্র সমাজচ্যুত হন। রবীন্দ্রনাথ যাদবচন্দ্রের স্থানীয় বাড়িতে এসেছিলেন।

দেওয়ানের বেড়ঃ কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত এবং রাণাঘাট-গেদে রেলপথের মাজদিয়া স্টেশন থেকে ২ মাইল (৩·২ কি. মি.) পুবে অবস্থিত প্রাচীন গ্রাম। গ্রামটির তিন দিকে বিরাট বিল। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রকে এ গ্রামটি দান করেন। রঘুনন্দন এখানে বিশাল ভদ্রাসন ও শিবমন্দিরাদি নির্মাণ করেন। সেসব দেবালয় এবং অট্টালিকার অধিকাংশই এখন বিধ্বস্ত। একটি পৃথক বাড়িতে রঘুনন্দনের বংশধরেরা এ গ্রামে এখনও বাস করেন। দেওয়ানের বাড়ি থেকে গ্রামের নাম দেওয়ানের বেড় হয়েছে ব'লে মনে হয়।

দেপাড়াঃ কোতোয়ালী (কৃষ্ণনগর) থানার অন্তর্গত এবং কৃষ্ণনগর শহর থেকে ৪ মাইল (৬·৪ কি.মি.) দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত প্রাচীন গ্রাম। পূর্ব নাম দেবপল্লী। কৃষ্ণনগর থেকে পাকা রাস্তায় সাইকেল-রিক্‌শ বা বাসযোগে যাওয়া যায়।

এখানে নৃসিংহদেবের প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি ও বহু পুরাতন এক পাথরের মন্দিরের সামান্য কিছু ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। নৃসিংহদেবের বর্তমান দালান-মন্দিরটি নদীয়ারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কার করিয়ে দেন। মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ লিপিঃ

"শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবো জয়তি।
নাগেন্দুগজভূশাকে শ্রীনৃসিংহপদাশ্রিতঃ।
শ্রীক্ষিতীশো নৃসিংহস্য সংশ্চক্রে মন্দিরং নৃপঃ॥
শকাব্দা : ১৮১৮ Repaired in 1896"

অর্থাৎ শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের জয় হোক। নৃসিংহদেবের পদাশ্রয়ী রাজা ক্ষিতীশ ১৮১৮ শকাব্দে নৃসিংহদেবের এই মন্দির সংস্কার করলেন। এখানে 'নাগ'=৮, 'ইন্দু'=১, 'গজ'=৮ ও 'ভূ'=১ ধ'রে সংস্কারকাল ১৮১৮

শক অর্থাৎ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ। অদূরের মায়াপুর মঠের সৌজন্যে গর্ভগৃহের বাইরের দেওয়ালে আর একটি ফলক নিবদ্ধ হয়েছে। তার পাঠ :

"বাগীশ যস্য বদনে
লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি
যস্যান্তে হৃদয়ে সংবিৎ
তং নৃসিংহর্মহং ভজে॥"

কালো পাথরে ক্ষোদিত নৃসিংহদেবের চতুর্ভুজ মূর্তিটির উচ্চতা ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি (১·৪ মি.) ও প্রস্থ ২ ফুট ৩ ইঞ্চি (৬৮ সে.মি.)। নৃসিংহাবতারে বিষ্ণুর হিরণ্যকশিপুবধের দৃশ্য মূর্তিটিতে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত। পদতলে প্রার্থনারত ভক্ত প্রহ্লাদ এবং অঙ্কে বিদীর্ণউদর হিরণ্যকশিপু। মূর্তিটির বহুস্থানে অঙ্গহানি হয়েছে। জনশ্রুতি, মূর্তিটির কোথাও নাকি একটি পরশপাথর লুকানো ছিল, যার খোঁজে এক লোভী সন্ন্যাসী বিগ্রহের নানা অঙ্গ ভেঙে ফেলে। মতান্তরে, এর জন্য দায়ী নাকি কালাপাহাড়। আদিতে ভূপ্রোথিত মূর্তিটির অসতর্ক উদ্ধারের সময় এহেন ক্ষতি হয়ে থাকাটাই বেশী সম্ভব। প্রবাদ আছে, বহুদূর খনন করেও মূর্তিটির তলদেশ পাওয়া যায়নি। অনাদি অর্থাৎ স্বয়ং-প্রকাশ হওয়ার জন্য, অঙ্গহানি হওয়া সত্ত্বেও, বিগ্রহটি নিত্যপূজিত। নৃসিংহদেবের মাহাত্ম্য বিষয়ে বহু লোককাহিনী এ অঞ্চলে সুপ্রচলিত। তাঁর প্রসাদী পরমান্ন দিয়ে নবজাত শিশুর অন্নপ্রাশন হয়। তিনি বন্ধ্যাত্বও দূর করেন ব'লে সাধারণের বিশ্বাস। মানত ক'রে মন্দির-প্রাঙ্গনের অতি প্রাচীন এক তমাল গাছে ঢিল বাঁধা ও মনস্কামনা পূর্ণ হলে ঠাকুরের কাছে পূজা দিয়ে সে ঢিল খুলে নেবার ধর্মীয় রীতিটি এখানে বহুলঅনুসৃত। নদীয়ারাজ প্রদত্ত নিষ্কর ভূমির আয় ও প্রণামী থেকে মুখোপাধ্যায়বংশীয় পুরোহিতরা নিত্যপূজা ও উৎসবাদির খরচ চালান। ফাল্গুন মাসের দোলপূর্ণিমায় মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে এখানে মহোৎসব হয়। তা ছাড়া, বৈশাখ মাসের শুক্লাচতুর্দশী তিথিতেও এখানে উৎসব হয়ে থাকে।

নৃসিংহদেবের প্রাচীন মন্দিরটি জঙ্গলাবৃত এক উচ্চ ভূখণ্ডে অবস্থিত ছিল। কারুকার্যখচিত বহু পুরাতন ইট ও পাথর সেখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলি সম্ভবতঃ আদি দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ। অনেকের মতে, মূর্তিটি সেনরাজাদের প্রতিষ্ঠিত। শ্রীচৈতন্যদেব পরিক্রমায় বার হয়ে এখানে নাকি নৃসিংহদেবকে দর্শন করেছিলেন।

মন্দিরের পাশেই চামটার বিল। বিলটি আগে আরও বিরাট ছিল।

সেখান থেকে একদা ব্রোঞ্জনির্মিত একটি সুন্দর উগ্রতারামূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। বৌদ্ধতন্ত্রে উগ্রতারা দেবীর অপর নাম চামুণ্ডা। বিলের কাছে নাকি চামুণ্ডা দেবীর একটি মন্দিরও ছিল। চামুণ্ডা থেকে, অপভ্রংশে, চামটা কথাটির উৎপত্তি হওয়া সম্ভব।

দেবগ্রাম ঃ কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত এবং শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথের দেবগ্রাম স্টেশনসংলগ্ন প্রাচীন গ্রাম। ৩৪ নং জাতীয় সড়ক গ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়েছে।

এখানে কয়েকটি উঁচু ঢিপি ও প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। এগুলি সেনরাজাদের জয়স্কন্ধাবার বা সেনানিবাসের অংশ ব'লে মনে হয়।

দেবকুণ্ড নামে পরিচিত এখানকার এক দীঘি থেকে একদা নাকি মূর্তিযুক্ত কয়েকটি পাথর পাওয়া গিয়েছিল। নকশাখচিত প্রাচীন পাথর এখানকার কয়েকটি স্থানে এখনও পড়ে আছে। এগুলি প্রাচীন কোন দেবসৌধের অংশ হতে পারে। স্থানীয় কালুরবাগ এলাকায় এক গড়ের ধ্বংসাবশেষ ছিল।

দেবগ্রাম একদা সংস্কৃতচর্চার জন্য খ্যাতিলাভ করে। বৈষ্ণব পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এখানকার অধিবাসী ছিলেন।

দুর্গাধ্যানে পূজিতা গ্রাম্য লোকদেবী কুলাইচণ্ডী স্থানীয় একটি আটকোণা দালান-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা। তাঁর মূর্তিটি পাথরের।

দেবগ্রাম ঃ রাণাঘাট থানার অন্তর্গত এবং রাণাঘাট-বনগাঁ রেলপথের গাংনাপুর স্টেশন থেকে কাঁচা রাস্তায় তিন মাইল (৪·৮ কি· মি·) উত্তর-পূর্বে অবস্থিত প্রাচীন গ্রাম।

এখানে দেবপাল নামে এক রাজার প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়। তা ছাড়া বেশ কয়েকটি ঢিপি এবং পুষ্করিণীও আছে। এনামেলকরা ইট, কারুকার্যময় পাথর প্রভৃতি নাকি একদা এখানে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

দেবপাল সম্পর্কে অনেক কাহিনী-কিংবদন্তী এ অঞ্চলে প্রচলিত। কুম্ভকারবংশীয় এ রাজার পতন হলে, নদীয়ারাজ রাঘব রায় তাঁর রাজ্য হস্তগত করেন। শোনা যায়, দেবপাল এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে একটি স্পর্শমণি অপহরণ ক'রে রাজ্যসম্পদ লাভ করেন। পরে সন্ন্যাসীর অভিশাপেই তাঁর পতন হয়। একবার যুদ্ধযাত্রার সময় দেবপাল রাণীদের নির্দেশ দিয়ে যান, যদি যুদ্ধে তাঁর পরাজয় ঘটে তা হলে তাঁর পায়রা রাজধানীতে ফিরে আসবে এবং রাণীরা তখন যেন সম্মানরক্ষার্থে আত্মবিসর্জন দেন। দেবপাল সেবার যুদ্ধে জয়লাভ

করলেও, অনবধানতাবশতঃ তাঁর পায়রা রাজধানীতে ফিরে আসে এবং রাণীরা খিড়কিপুকুরের জলে ডুবে প্রাণত্যাগ করেন। দেবপাল ফিরে এসে এ দুঃসংবাদ শুনে নিজেও আত্মহত্যা করেন।

দেবপালের গড়ের বাইরে কয়েকটি প্রাচীন ইটের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ছিল ব'লে বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'List of Ancient Monuments in Bengal' গ্রন্থের ১১৮ পৃষ্ঠায় নিম্নরূপ উল্লেখ আছেঃ "Outside the fort are the ruins of several large temples which appear to be of great interest and of some antiquity, as evidenced by the size of the bricks. They are the only undoubtedly pre-Muhammadan ruins seen or heard of in the district." সে সব মন্দিরের কোন চিহ্ন এখন আর দেখা যায় না। তবে চারটি উঁচু ঢিপি এখনও আছে। শোনা যায়, শত্রু বাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণ লক্ষ্য করবার জন্যই নাকি এই নিরীক্ষণকেন্দ্রগুলি নির্মিত হয়েছিল।

দোগাছি : কোতোয়ালী (কৃষ্ণনগর) থানার অন্তর্গত এবং কৃষ্ণনগর শহর থেকে ২ মাইল (৩·২ কি. মি.) দক্ষিণ-পূর্বে, অঞ্জনা নদীতীরে অবস্থিত, পুরাকীর্তিসমৃদ্ধ গ্রাম। কৃষ্ণনগর রেল-স্টেশন থেকে কিছু পাকা ও কিছু কাঁচা পথে সাইকেল-রিক্‌শয় যাওয়া যায়। এখানে পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত অতি জীর্ণ একটি মন্দির আছে। শিখরদেশ এখন এতদূর ভগ্ন যে আদিতে এটির চারচালা গড়ন অনুমান ক'রে নিতে হয়। দেওয়ালগুলি, উপরের দিকে, পরস্পরবিচ্ছিন্ন হওয়ায়, যে কোনও সময়ে ভেঙে পড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে পারে। দক্ষিণমুখী (পশ্চিমেও একটি দরজা আছে), এ পরিত্যক্ত শিবমন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৮ ফুট ৫ ইঞ্চি × ১৮ ফুট ৩ ইঞ্চি (৫·৬ মি. × ৫·৫ মি.) ও বর্তমান উচ্চতায় প্রায় ২০ ফুট (৬·১ মি.)। ভিতরের গম্বুজাকৃতি ছাদ চার কোণের লহরার সাহায্যে স্থাপিত ছিল। সামনের দেওয়ালে 'টেরাকোটা'-সজ্জার মধ্যে হংসলতা, কৃষ্ণলীলা, রহু মহন্ত এবং কিন্নর-কিন্নরীই প্রধান। কয়েকটি মিথুন-ভাস্কর্যও আছে। পশ্চিমের দেওয়ালে বড় বড় পদ্মেরই সমারোহ। এসবের কারিগরি ও অবস্থান দিগ্‌নগরের মূল মন্দিরটির এতই অনুরূপ যে প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটিও রাজা রাঘবের সময় একই শিল্পিগোষ্ঠীর দ্বারা নির্মিত হয়েছিল মনে হয়।

এ দেবালয়ের অদূরে একটি প্রাচীন দালান-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সেটি পরমবৈষ্ণব দ্বিজ বলরামদাস গোস্বামীর শ্রীপাটরূপে পরিচিত। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু নাকি এখানে একবার এসেছিলেন।

আগে এখানে প্রতিবছর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাচতুর্দশীতে 'মূলার মহোৎসব' ও মেলা হত। প্রদর্শিত নিত্যানন্দের পাগড়ি ছিল সে উৎসবের প্রধান আকর্ষণ। এখন এই উৎসব হয় নবদ্বীপে।

এখানে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মাটি খুঁড়ে কপিলমুনির এক বিশালকায় প্রস্তরমূর্তি পাওয়া যায়। ধ্যানরত ভঙ্গিতে নির্মিত মূর্তিটির গাল ও চিবুক শ্মশ্রুযুক্ত এবং মস্তক জটাজুটমণ্ডিত। দু পাশে দণ্ডায়মান দুই পার্শ্বচর। কৃষ্ণনগর পৌরসভার তৎকালীন উপ-পৌরপতি শ্রীমোহনকালী বিশ্বাস মূর্তিটি কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়মকে দান করেন।

দোগাছির পার্শ্ববর্তী বারুইহুদা গ্রামে দুটি ইটের চারচালা-শিবমন্দির আছে। প্রতিষ্ঠালিপি বা পোড়ামাটির অলংকরণ না থাকলেও মন্দির দুটি প্রাচীন। এই গ্রামে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে রামতনু লাহিড়ীর জন্ম হয়।

ধর্মদহ ঃ নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত এবং শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথের মুড়াগাছা স্টেশন থেকে কাঁচা রাস্তায় ২ মাইল (৩.২ কি. মি.) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

ধর্মদহ প্রাচীন গ্রাম। এড়ু মিশ্র-কৃত কারিকা অনুযায়ী, ধর্ম নামে জনৈক নৃপতির নাম অনুসারে এ গ্রামের নাম। আবার অনেকে বলেন, লৌকিক দেবতা ধর্মরাজের নাম থেকেই গ্রামের নাম হয়েছে ধর্মদহ। এখানে নদীয়া-রাজের বৃত্তিভোগী পণ্ডিতদের বাস ছিল। স্থানীয় চারচালা গোপীনাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি থেকে দেখা যায়, সেটি ১২৫৬ বঙ্গাব্দে (১৮৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে) রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্তৃক স্থাপিত হয় এবং তিনিই গোপীনাথের কষ্টিপাথরের বিগ্রহটি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরে নিত্যপূজা আজও অব্যাহত এবং রাস, দোল ইত্যাদি উৎসবও হয়ে থাকে। দেবালয়টি বিভিন্ন সময়ে সংলগ্ন রাসমণ্ডপসমেত সংস্কৃত হয়েছে।

পার্শ্ববর্তী কাঁচকুলি গ্রামেও একদা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের বাস ছিল।

নবদ্বীপ ঃ নবদ্বীপ শহর ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে, ভাগীরথী ও জলঙ্গী নদীর সঙ্গমস্থলের কাছে, অবস্থিত। কৃষ্ণনগর থেকে বাসপথে অথবা কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ ছোট রেলপথে ৮ মাইল (১২.৯ কি.মি.) পশ্চিমে নবদ্বীপঘাট থেকে খেয়া নৌকায় ভাগীরথী পার হয়ে নবদ্বীপে যেতে হয়। ব্যাণ্ডেল-বারহারোয়া রেলপথের নবদ্বীপধাম স্টেশনে নেমেও নবদ্বীপে যাওয়া যায়।

নবদ্বীপ প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থ এবং কোন কোন গবেষকের মতে, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবভূমি। মতান্তরে, বর্তমান মায়াপুরই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান। (এই বিতর্কিত বিষয়টি সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা

বর্তমান গ্রন্থের স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। উৎসাহী পাঠক সেজন্য মায়াপুর মঠ থেকে প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট পুস্তক-পুস্তিকা এবং ৩ শ্রাবণ ১৩৮২ সালের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীক্ষুদিরাম দাসের 'শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি নবদ্বীপ' নামের প্রবন্ধটি দেখতে পারেন)। এখানে শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণবদের মন্দির-আখড়াদি আছে এবং বৎসরের বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

পাল এবং সেনরাজাদের সময়ে নবদ্বীপ ছিল অন্যতম রাজধানী। মিন্‌হাজ-উদ্দীন কথিত নূদীয়া নগর বা নোদীয়াহ্‌-ই নবদ্বীপ। বিভিন্ন কুলজী গ্রন্থমালা দ্বারা এই মতটি সমর্থিত। 'সম্বন্ধনির্ণয়' ও 'বল্লালচরিত' গ্রন্থমতে, বল্লালসেন বৃদ্ধ বয়সে নবদ্বীপ রাজধানীতে বাস করতেন।

নবদ্বীপের বিদ্যাচর্চা প্রাচীনত্বে খ্যাত। নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজের গৌরবে নবদ্বীপ ইতিহাসে উজ্জ্বল। 'চৈতন্যভাগবতে' আছে:

"নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥"

পালযুগে নবদ্বীপ বৌদ্ধধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। নবদ্বীপ শহরের পশ্চিম উপকণ্ঠে, রেল-স্টেশনের কাছে, পাড়ডাঙা নামে উঁচু ঢিপিটি বৌদ্ধস্তূপ পাহাড়পুর নামে পরিচিত। 'চৈতন্যভাগবত' প্রভৃতি গ্রন্থেও পাড়ডাঙার উল্লেখ আছে। নবদ্বীপের বৌদ্ধপ্রভাবিত মূর্তি ও প্রস্তরখণ্ডাদি সবই পাড়ডাঙা থেকে প্রাপ্ত। পাড়ডাঙায় নাকি এক বৌদ্ধবিহার ছিল।

নবদ্বীপের যোগনাথতলাপাড়ায় দালান-শিবমন্দিরে নিত্যপূজিত পাড়ডাঙার শিব একটি হস্তপদহীন কূর্মাকৃতি প্রস্তরখণ্ড। বৌদ্ধ মতে, এই ধরণের প্রস্তরখণ্ড শূন্যতাজ্ঞাপক। জনশ্রুতি, এটি নাকি সম্রাট অশোক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। প্রায় দু শ বছর আগে এই 'বিগ্রহ'টি পাড়ডাঙায় পাওয়া যায়। একই মন্দিরে নিত্যউপাসিত আর একটি 'মূর্তি' হল লোড়াকৃতি যুগনাথ শিব, যা মহারাজ হর্ষবর্ধনের সময়ে প্রতিষ্ঠিত ব'লে কিংবদন্তী। সেটিও পাড়ডাঙাতেই প্রাপ্ত। যুগনাথ মন্দিরে, একই স্থান থেকে আবিষ্কৃত, ধাতুনির্মিত একটি পদ্মপাণি-বুদ্ধমূর্তি ছিল।

এখানকার দণ্ডপাণিতলায় দণ্ডপাণি শিবের ধাতুনির্মিত মূল মূর্তিটি ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে গাজনের সময় হঠাৎ পড়ে গিয়ে ভেঙে গেলে, ভগ্ন মূর্তিটিকে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয় ও সেটির অনুরূপ আর একটি পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে এক দালান-মন্দিরে তাঁর নিত্যপূজা অব্যাহত রাখা হয়। আদি মূর্তিটির অনুসরণে একটি মাটির মুখোশও

তৈরি ক'রে রাখা হয়েছে। দণ্ডপাণি শিবের বর্তমান দণ্ডায়মান মূর্তিটির ডানপদ বামপদের উরুর উপর স্থাপিত। জটাজুটমণ্ডিত মস্তকের দু দিকে সাপ। দ্বিভুজ মূর্তিটির ডান হাত উর্ধ্বে উত্তোলিত এবং বাম হাতে দণ্ড। পায়ের নীচে হাঁস এবং মড়ার মাথার খুলি। দণ্ডপাণি শব্দের অর্থ যম, ধর্মরাজ বা বুদ্ধ। অনেকে সেজন্য মূর্তিটিকে বুদ্ধমূর্তি বা বৌদ্ধশ্রমণমূর্তি ব'লে অনুমান করেন। দণ্ডপাণির মন্দিরে তরমুজের মত লম্বা আকারের একটি প্রস্তরখণ্ডও নিত্যপূজিত হয়ে থাকে।

এখানকার বিভিন্ন স্থানে শিবরূপে পূজিত প্রস্তরখণ্ডগুলি লিঙ্গমূর্তি নয়। কোনটি লোড়াকৃতি, কোনটি বুদ্ধমূর্তি আবার কোনটিতে বৌদ্ধ প্রতীকচিহ্ন অঙ্কিত আছে। ধ্যানস্থ এক বৌদ্ধমূর্তি এখানে ষষ্ঠীঠাকুরাণী-রূপে পূজিতা। ভবতারণ শিবমন্দিরে রক্ষিত একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরে পদ্মপাণি-বুদ্ধমূর্তি ক্ষোদিত আছে। দেয়ারাপাড়ায় নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ইটের দালান-মন্দিরে নিত্যপূজিত লিঙ্গমূর্তিটি 'এ্যালানে শিব' বা অলোকনাথ শিব নামে পরিচিত।

নবদ্বীপের 'পোড়া-মা'তলায় প্রাচীন বটবৃক্ষতলে স্থাপিতা 'পোড়া-মা' এক জাগ্রত লোকায়ত দেবী। 'পোড়া-মা'কে ঘিরে অনেক লোককাহিনী শোনা যায়। যেমন, বৃহদ্রথ নামে এক সিদ্ধসন্ন্যাসী নাকি নবদ্বীপে বনমধ্যে জন্মমাতার ঘট স্থাপন করেছিলেন। পরে, পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম নবদ্বীপের কেন্দ্রস্থলে বৃক্ষতলে ঘটটি পুনঃস্থাপন ক'রে সেখানে এক চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেন। একদা আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে বৃক্ষটি পুড়ে গেলে, দেবী 'পোড়া-মা' নামে পরিচিত হন।

'পোড়া-মা'তলায় নদীয়ারাজ গিরীশচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত ভবতারণ শিবের এবং ভবতারিণী কালীর দুটি রত্ন-মন্দির আছে। প্রতিষ্ঠাকাল ১২৩২ বঙ্গাব্দ (১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ)। শোনা যায়, নদীয়ারাজ রুদ্র রায় রাঘবেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে এক মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে, গঙ্গার ভাঙনে মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে, শিবলিঙ্গটিকে গঙ্গাতীরে প্রোথিত ক'রে রাখা হয়। গিরীশচন্দ্র সেই বৃহদাকার শিবলিঙ্গটিকেই পরে ভবতারণ নাম দিয়ে 'পোড়া-মা'তলার মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। ভবতারিণী মূর্তিটি নাকি আগে নদীয়ারাজ রাঘব রায় প্রতিষ্ঠিত গণেশমূর্তি ছিল। গঙ্গাতীরের গণেশ মন্দির গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হলে, গিরীশচন্দ্র শুঁড় ভগ্ন অবস্থায় মূর্তিটি উদ্ধার করেন। নবদ্বীপপণ্ডিত-সমাজের মতানুসারে, গিরীশচন্দ্র নাকি অঙ্গহীন মূর্তিটিকে ধ্যানানুযায়ী ভবতারিণী মূর্তিতে পরিণত ক'রে ভবতারিণী মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন।

এখানকার বুড়োশিবতলায় ইটের তৈরী এক সুউচ্চ পঞ্চরত্ন-মন্দিরে 'বুড়োশিব' নামে পরিচিত প্রস্তরখণ্ড ছাড়া আছে এক প্রস্তরনির্মিত দশ-ভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি (১৮ ইঞ্চি × ৮ ইঞ্চি অর্থাৎ ৪৬ সে. মি. × ২০ সে. মি.), প্রস্তরনির্মিত গণেশমূর্তি, সূর্য নামে পরিচিত এক ক্ষুদ্র স্ফটিকখণ্ড এবং ধাতব (তামার) মঙ্গলচণ্ডী। বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে 'বুড়োশিবে'র উল্লেখ আছে। শোনা যায়, শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব থেকেই তিনি এখানে উপাসিত হয়ে আসছেন।

'তন্ত্রসার'প্রণেতা তান্ত্রিকাচার্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ষোড়শ শতকে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনিই তন্ত্রোক্ত কালীর সাকার মূর্তি এবং পূজাবিধির প্রচলন করেন।

নবদ্বীপে মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাস এই পঞ্চপ্রভুর মন্দির বৈষ্ণবদের পরম তীর্থস্থল। মহাপ্রভুপাড়ায়, মহাপ্রভু-বাড়িতে, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ বিগ্রহ ও একটি প্রাচীন আটচালা-মন্দির আছে।

নবদ্বীপে বৈষ্ণব সাধু তোতা রামদাস বাবাজী প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব আখড়ার নাম 'বড় আখড়া' (স্থাপিত ১২০২ বঙ্গাব্দ)। তার সামনে, আনুমানিক ১২৫০ বঙ্গাব্দে, মাধবচন্দ্র দত্ত এক নাটমন্দির নির্মাণ করেন। লর্ড হেষ্টিংসের দেওয়ান, কান্দী জমিদার-বংশের প্রতিষ্ঠাতা, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে যে মহাপ্রভুর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তা গঙ্গাগর্ভে লুপ্ত হয়।

মণিপুররাজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাগ্যচন্দ্র নদীয়ারাজের সহায়তায় ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপে মহাপ্রভুর আর এক বিগ্রহ ('অনুমহাপ্রভু' নামে পরিচিত) প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এ এলাকার নাম হয় মণিপুর। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুররাজ-বংশধরেরা এখানে এক স্বর্ণচূড় একরত্ন-মন্দির নির্মাণ করেন ও বংশপরম্পরায় মহাপ্রভু-বিগ্রহের সেবাপূজার ব্যবস্থা করেন। বাংলায় অন্য কোথাও সুবর্ণমন্দির নেই। অবশ্য, এখন সোনার পাতগুলি খুলে অন্যত্র রাখা হয়েছে।

এখানকার বৈষ্ণব সাধু চৈতন্যদাস এবং জগন্নাথদাস বাবাজীর আখড়া দুটিও বহুদিনের। তা ছাড়া, সোনার গৌরাঙ্গ ও ষড়্ভুজ মন্দির দুটিও প্রাচীন।

গুরুদাস দাস নামের জনৈক কাংস্যবণিক ১৭৫৭ শকে (১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে) যে দ্বাদশ-শিবমন্দির স্থাপন করেন তার প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "ওঁ নমঃ শিবায় ॥ শকাব্দা ১৭৫৭ ॥ / অন্তস্তাবনল তদাহরি

বিধীয়স্তাথ উর্দ্ধে গতৌ / জ্ঞাতুং শ্রীগুরুদাস ইতি যত্তক্তস্তবস্তঃ প্রভুঃ / শাকে ধাতু কলম্বগোত্রশশিমে তস্তাসুমে মন্দিরে / সংসারার্ণব তারণৈকতরণিং তংশম্ভুমস্থাপয়ৎ॥" এখানে 'ধাতু' = ৭, 'কলম্ব' (বাণ) = ৫, 'গোত্র' (পর্বত) = ৭ ও 'শশী' = ১ ধ'রে হয়েছে ১৭৫৭ শক।

সাধারণের কাছে পল্লীমাতা বা 'পাড়ার-মা' নামে পরিচিতা সিদ্ধেশ্বরী কালী নবদ্বীপের এক প্রাচীন দেবী। তাঁর সাধনায় অনেক সাধক নাকি সিদ্ধিলাভ করেছেন।

এখানকার সহজেপাড়ায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের এক লৌকিক শাখা সহজিয়া উপ-সম্প্রদায়ের একটি কেন্দ্র আছে।

নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগারে প্রচুরসংখ্যক প্রাচীন পুঁথি এবং কয়েকটি পুঁথির চিত্রিত কাষ্ঠাবরণ ('পাটা') আছে। এগুলিও উল্লেখ্য পুরাবস্তু।

নাকাশীপাড়া : নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত এবং শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথের বেথুয়াডহরী ষ্টেশন থেকে পাকা রাস্তায় ৩ মাইল (৪.৮ কি. মি.) পশ্চিমে অবস্থিত। এ পথে যাতায়াতের জন্য সাইকেল-রিক্‌শ পাওয়া যায়।

এখানে সিংহরায় পদবীধারী জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত তিনটি পাশাপাশি চারচালা-মন্দির আছে। প্রতিষ্ঠাফলক বা পোড়ামাটির অলংকরণ নেই। তবে দেবালয় তিনটির সামনের দেওয়ালে কিছু পঙ্খের কাজ দেখা যায়। সিংহরায়দের পূজার দালানেও অনুরূপ কারুকার্য আছে। কমবেশি দেড় শ বছর আগে, মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পের অবনতির যুগে, নব পর্যায়ে পঙ্খের অলংকরণের সূচনা হয়। অতএব, এ পুরাকীর্তিগুলি অনধিক ১৫০ বছরের প্রাচীন হতে পারে।

এখানকার ব্রহ্মাণীতলায় লৌকিক দেবী ব্রহ্মাণীর পূজা উপলক্ষে প্রতিবছর শ্রাবণসংক্রান্তিতে মেলা বসে। হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে পূজা দেয়, মানত করে। প্রচুর পশুবলিও হয়। বিরাট এক অশ্বত্থবৃক্ষের নীচে ব্রহ্মাণী দেবীর থান। বাঁধানো বৃক্ষতলে ঘট বসিয়ে তাঁর পূজা হয়। তিনি সর্পদেবী মনসার প্রকারভেদ। স্থানীয় জমিদার ডোমনচন্দ্র সিংহরায় নাকি স্বপ্নাদেশে এই পূজা প্রবর্তন করেন।

নাকাশীপাড়াসংলগ্ন গোটপাড়া গ্রামে শিবলিঙ্গসহ একটি প্রাচীন চারচালা-শিবমন্দির আছে। সেখানে প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমা তিথিতে গোপীনাথদেব বিগ্রহের স্নানযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তিনি দ্বিভুজ, বংশীধারী, শ্রীকৃষ্ণমূর্তি। জনশ্রুতি, বিগ্রহটি নাকি শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক

প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে তিনি কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে রক্ষিত ও উপাসিত। স্নানযাত্রা উৎসবের সময় তাঁকে এখানে আনা হয়।

নাংলা ঃ নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত এবং ৩৪নং জাতীয় সড়কের পাশে গাছা গ্রাম থেকে দুর্গম কাঁচা রাস্তায় ৩ মাইল (৪'৮ কি.মি.) উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।

এখানে কয়েকটি বিরাট প্রাচীন বৃক্ষের মিলনস্থলের নীচের বেদীতে একটি সাদাটে বেলেপাথরের গায়ে উৎকীর্ণ এক মূর্তির অবয়বে বুদ্ধমূর্তির ক্ষীণ সাদৃশ্য দেখা যায়। স্থানটির লোকায়ত নাম সাহেবতলা। সেখানে প্রতিবৎসর আষাঢ় মাসের অম্বুবাচী তিথিতে এবং মাঘীপূর্ণিমায় বেশ বড় মেলা বসে। ভক্তেরা মূর্তির গায়ে দুধ ঢালে, তাঁর উদ্দেশে শিরনি, মুরগি বলি এবং মানতের উৎসর্গ ('ছলন') হিসাবে ছোট ছোট পোড়ামাটির ঘোড়া দেয়। 'ছলনে'র ঘোড়ার এক বিরাট স্তূপ এখানকার 'না-জানি' বৃক্ষতলে জমে আছে। এ গাছের নাম কেউ জানেনা ব'লে এহেন নামকরণ হয়েছে। হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে সকলেই এখানে পূজা দেয়, মানত করে। ফকির কাটাপীর সাহেবের সমাধি এবং খড়ের চারচালাযুক্ত তাঁর আস্তানাও অন্যতম স্থানীয় দ্রষ্টব্য। শুধুমাত্র মানুষের রোগ নিরাময়ের জন্যই নয়, গৃহপালিত পশুপাখির ব্যাধি উপশমের জন্যও এখানে মানত করা হয়।

সংলগ্ন গ্রাম দোগাছিয়া। সেখানকার দুঃখীরাম পাল ও অন্যান্যেরা চৈতন্য-বৈষ্ণবধর্মের উপশাখা 'সাহেবধনী' লোকধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ইটের এক ছোট চারচালা-গৃহে তাঁরা এখানে সমাহিত। 'সাহেবধনী'দের মধ্যে বিগ্রহপূজা বা জাতিভেদ প্রথা নেই; সকলেরই সমানাধিকার। উৎসবকালে সামুদায়িক পঙ্ক্তিভোজন এই লোকধর্মের বৈশিষ্ট্য। অগ্রদ্বীপে তাঁদের বাৎসরিক উৎসব হয়ে থাকে। দুঃখীরাম পালের পুত্র চরণ পাল নিকটবর্তী বৃত্তিহুদা গ্রামে [চাপড়া থানার অন্তর্গত এবং কৃষ্ণনগর-করিমপুর বাসপথে লক্ষ্মীগাছা গ্রামে নেমে, পশ্চিমে, জলঙ্গী নদীর দিকে, কাঁচা পথে ২ মাইল (৩'২ কি.মি.) দূরে অবস্থিত] 'সাহেবধনী' সম্প্রদায়ের শ্রীপাট প্রতিষ্ঠা করেন। প্রখ্যাত লোকগীতিকার কুবির সরকার (গোঁসাই) চরণ পালের শিষ্য ছিলেন। কুবির-রচিত গানের সংখ্যা বারো শতেরও বেশী। তাঁর গান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবও গাইতেন। ভক্তদের কাছে বৃত্তিহুদা বৃন্দাবনতুল্য। এ সম্পর্কে কুবিরের গানে আছে ঃ

"ওরে বৃন্দাবন হতে বড় শ্রীপাট হুদা গ্রাম।
যেথা দিবানিশি শুনি দীনবন্ধু নাম॥"

নদীয়া জেলার আর একটি উল্লেখ্য লোকধর্ম-সম্প্রদায় 'বলাহাড়ি' বা 'বলরামী'দের (বলরাম হাড়ি প্রবর্তিত) বর্তমান আখড়া তেহট্ট থানার নিশ্চিন্তপুর গ্রামে অবস্থিত।

নাংলার পার্শ্ববর্তী পল্লীর নাম শালিগ্রাম। কিংবদন্তী, সেখানে নাকি একদা শালিবাহন রাজার রাজধানী ছিল। এ গ্রামে কয়েকটি প্রাচীন উঁচু টিপি এবং দীঘি আছে। একটি দীঘি ও এক নদীখাত থেকে পালযুগের কিছু বুদ্ধমূর্তির ভগ্নাবশেষ নাকি এক সময়ে পাওয়া গিয়েছিল।

পলাশীঃ কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত এবং শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথে পলাশী স্টেশনের ১ মাইল (১·৬ কি.মি.) পশ্চিমে অবস্থিত। একদা এখানে নাকি প্রচুর পলাশ গাছ থাকার জন্য গ্রামের নাম হয় পলাশী।

পলাশীর বিস্তৃত আমবাগান ও সন্নিহিত স্থানে, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জুন, নবাব সিরাজদ্দৌল্লার সঙ্গে ক্লাইভের যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতাসূর্য অস্ত যায়। পরবর্তী ইতিহাস সকলেরই জানা।

পলাশীযুদ্ধের স্মারক হিসাবে, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে, ইংরেজ সরকার এখানে এক 'গ্রানিট'-পাথরের ক্ষুদ্র বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন। লর্ড কার্জন ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে সেটির পরিবর্তে বর্তমান বৃহত্তর স্তম্ভটি নির্মাণ করিয়ে দেন। এই স্তম্ভের সন্নিকটে দৌলত আলি বা আকবর আলি বা বাহাদুর আলির সমাধি আছে। ইনি পলাশীযুদ্ধে নবাবপক্ষে থেকে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণত্যাগ করেন ব'লে শোনা যায়।

শাহ্ মনোহর পীর সাহেবের প্রাচীন সমাধিটি স্থানীয় দ্রষ্টব্যের অন্যতম। তিনি নাকি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর সমাধিতে হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে মানত করে, পূজা দেয়।

পাগলাচণ্ডীঃ কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত ও শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথের পাগলাচণ্ডী স্টেশনসংলগ্ন গ্রাম।

রেল-স্টেশন থেকে পুব দিকে কাঁচা পথে ২ মাইল (৩·২ কি.মি.) দূরে পাগলা নামক প্রাচীন স্থানে, সুগভীর পাগলাচণ্ডী দহের দক্ষিণে, দেবী চণ্ডীর এক প্রস্তরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। গ্রামের ও দহের নাম হয়েছে দেবীর নামানুসারে। সম্প্রতি দেবীর জন্য চূড়াযুক্ত এক দালান-মন্দির নির্মিত হয়েছে। বৈশাখ মাসের প্রতি মঙ্গলবারে এবং বৈশাখীপূর্ণিমায় দেবীর বিশেষ পূজা হয়ে থাকে। পাগলাচণ্ডী জাগ্রত গ্রাম্যদেবী। তাঁর কষ্টিপাথরের মূর্তিটির অধিকাংশই ভূপ্রোথিত।

পাগলাচণ্ডী রেল-স্টেশনসংলগ্ন পাণিঘাটা গ্রামে, ৩৪নং জাতীয় সড়কের পাশে, পাগলাচণ্ডী দহের সেতুর কাছে, দহের দক্ষিণ তীরে, বকুল গাছের তলায় বাঁধানো বেদীর উপর এক ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি আছে। মূর্তিটি একদা দহ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল ব'লে শোনা যায়।

পানশিলাঃ নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত এবং কৃষ্ণনগর শহর থেকে ৮ মাইল (১২·৯ কি. মি.) পশ্চিমে, ভাগীরথী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত প্রাচীন গ্রাম। এখানে একটি উঁচু ঢিপির কাছে একখণ্ড পাথরে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে ক্ষোদিত আছেঃ

"খলেতা অয়গ্ শ্রীমতী সিব
খলেতা অয়গ্ শ্রীমতী মঞ্জু ঘোষ
খলেতা অয়গ্ শ্রীমতী যোগেশ"

এখানে সিব অর্থে মহাদেব, মঞ্জু ঘোষ অর্থে বোধিসত্ত্ব এবং যোগেশ অর্থে বুদ্ধ বা ধর্মকে বোঝানো হয়েছে ব'লে অনুমিত হয়। বৌদ্ধধর্মের ত্রিশরণ বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ, যথাক্রমে, শিব, মঞ্জু ঘোষ ও যোগেশে পরিণত হয়ে থাকতে পারে। পালরাজাদের সময়ে এই সব অঞ্চল বৌদ্ধধর্মপ্রভাবিত ছিল। পরে শূর ও সেন আমলে বৌদ্ধপ্রভাব হ্রাস পায় এবং তখন. বুদ্ধ, শিব বা ধর্মঠাকুরে পরিণত হন। •

পানশিলা নামটি অর্থবহ কেননা তার সঙ্গে বৌদ্ধকেন্দ্র তক্ষশিলা, বিক্রমশিলা প্রভৃতির মিল আছে। এখানে কয়েকটি উঁচু ঢিপিও দেখা যায়। গ্রামটি ভালুকার বিল নামে এক বিশাল জলাশয়ের তীরে অবস্থিত। পানশিলার সংলগ্ন গ্রামের নাম ভালুকা (কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত)। এই পল্লীটি 'ধর্মমঙ্গল' ও 'শূন্যপুরাণ' গ্রন্থাদিতে উল্লেখিত 'বল্লুকা'-র নামান্তর হতে পারে। বল্লুকা নদীতীরে ধর্মপূজা প্রথম প্রবর্তিত হয়। সেদিনের বল্লুকা নদী মজে গিয়ে আজ হয়ত ভালুকার বিলে পরিণত হয়েছে।

পানশিলা থেকে ৩ মাইল (৪·৮ কি. মি.) উত্তর-পশ্চিমে নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত মাজিদা বা মাজদিয়া গ্রাম। কৃষ্ণনগর-স্বরূপগঞ্জঘাট পিচের সড়কের পাশে অবস্থিত ফকিরতলা থেকে কাঁচা রাস্তায় এক মাইল (১·৬ কি. মি.) দূরে মাজদিয়ায় যাওয়া যায়। সেখানে হংসবাহনের বিলে 'হংসবাহন' নামে এক শিব আছেন। প্রতিবছর চৈত্রসংক্রান্তির সময় তাঁকে বিল থেকে তুলে এনে মাজদিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি পূজাঘরে উপাসনা ক'রে ১লা বৈশাখ আবার বিলের জলে রেখে আসতে হয়। মূর্তিটিকে 'হংসবদন'ও বলা হয়ে থাকে।

প্রস্তরনির্মিত বিগ্রহটি হংসের উপর পঞ্জরচিহ্নযুক্ত প্রাচীন মূর্তি ব'লে মনে হয়। বর্তমানে তিনি শিবরূপে বিবর্তিত এবং তাঁকে কেন্দ্র ক'রেই এখানকার গাজন উৎসব। সংবৎসর জলতলে থাকবার পর গাজনের সময় তিনি যখন উপরে ওঠেন, তখনও তাঁর মাথায় অবিরত জল ঢালা হয়। সেজন্য মূর্তিটির লোকায়ত নাম 'পানিশিলা'। তার থেকেই গ্রামের নাম পানশিলা হয়ে থাকবে।

পালপাড়া ঃ চাকদহ থানার অন্তর্গত এবং শিয়ালদহ-রাণাঘাট রেলপথের পালপাড়া স্টেশনসংলগ্ন প্রাচীন গ্রাম।

এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ কর্তৃক সংরক্ষিত একটি ইটের চারচালা-মন্দির। দক্ষিণমুখী এ দেবালয়ের দৈর্ঘ্য ২৬ ফুট ৮ ইঞ্চি (৮'১ মি.), প্রস্থ ২১ ফুট (৬'৪ মি.) ও উচ্চতা প্রায় ৪০ ফুট (১২'২ মি.)। কোন প্রতিষ্ঠাফলক না-থাকলেও, অন্যান্য বিচারে (যেমন, গম্বুজাকৃতি ভিতরের ছাদ, 'টেরাকোটা'-অলংকরণশৈলী), এটি খ্রীষ্টীয় সতরো শতকের সম্ভবতঃ প্রথম দিকে নির্মিত মনে হয়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'List of Ancient Monuments in Bengal' গ্রন্থে এ দেবায়তনটিকে ৫০০ বছরের পুরাতন ব'লে যে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে তা অবশ্যই অতিরঞ্জিত। অনুরূপ ভ্রান্তি 'বাংলায় ভ্রমণ' পুস্তকটিতেও (প্রথম খণ্ড ঃ পৃঃ ৮৫-৮৬) দেখা যায়। আয়তনে ও পোড়ামাটির অলংকরণ সৌকর্যে এটি যে নদীয়া জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দির তাতে সন্দেহ নেই। প্রতিষ্ঠাতা বা আদি বিগ্রহ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু জানা যায় না। বর্তমানে এখানে যে কালীমূর্তি উপাসিতা তা নিতান্তই অর্বাচীন।

এ মন্দিরের সামনের অংশে কোন দালান বা ঢাকা বারান্দা নেই। 'টেরাকোটা'-সজ্জা এখন শুধু প্রবেশদ্বারের পত্রাকৃতি খিলানের উপরে ও দু পাশে নিবদ্ধ। শোনা যায়, আগে নাকি সামনের দেওয়ালের সব স্থানেই পোড়ামাটির মূর্তি ও অলংকরণাদি ছিল। পিছনের দেওয়ালে কিছু 'টেরাকোটা'-পদ্ম এখনও দেখা যায়। প্রবেশ-খিলানের উপরে অতি সূক্ষ্ম নকাশি লতার উর্ধ্বে মোট ১৪টি আটচালা প্রতীক-দেবালয়ের ভিতর ছোট ছোট উপাসকমূর্তি উৎকীর্ণ আছে। তাদের দু পাশের ও উপরের দেওয়ালে নিবদ্ধ অতি সুন্দর বড় বড় পদ্মগুলির অধিকাংশই ভিন্ন গঠনের। দেওয়ালের বাঁ দিকের প্রান্তসংলগ্ন খাড়া ছয় সারি জ্যামিতিক নকশাও লক্ষণীয়। ডান প্রান্তের অনুরূপ সজ্জা সংস্কারের সময় নষ্ট হয়েছে। এত প্রচুর

জ্যামিতিক নকশা যে-কোন জেলার 'টেরাকোটা'-মন্দিরেই বিরল। প্রবেশপথের ঠিক উপরে লঙ্কাযুদ্ধের দৃশ্য—বাম দিকে ধনুর্বাণধারী রামচন্দ্র ও বানরসেনা আর ডান দিকে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও রাক্ষসগণ। আদিতে এই প্যানেলে আরও বহু মূর্তি ছিল। এখন তার অধিকাংশ লুপ্ত হলেও, রাম ও রাক্ষসবীরগণের ভাস্কর্য অতি উচ্চ শ্রেণীর নৈপুণ্যে বিধৃত। বস্তুতঃ, এত উৎকৃষ্ট পোড়ামাটির মূর্তি নদীয়া জেলার আর কোন মন্দিরে আছে কিনা সন্দেহ। এ ছাড়া নকাশি লতাগুলির মধ্যে সুকৌশলে বিন্যস্ত প্রথাগত ড্রাগনমূর্তিগুলিও 'টেরাকোটা'-সজ্জার প্রথম যুগের দক্ষতা ও সজীবতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ছোটবড় চারটি খিলানের উপর মন্দিরের গম্বুজাকৃতি ভিতরের ছাদ স্থাপিত। বাইরের চারচালা ছাদ সংস্কারের সময় হ্রস্বাকৃতি করা হয়েছে ব'লে মনে হয়।

মন্দিরটিতে অর্থবহ এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি ত্রিশূল আছে। শিবশক্তির মিলনের বা যোনিতত্ত্বের প্রতীকরূপে অনুমিত এ ধরনের ত্রিশূল বিরল।

এই মন্দিরে ছুটি শিলালিপি ছিল ব'লে শোনা যায়। একদা নাকি রাণাঘাটের জনৈক মহকুমাশাসক সে ছুটি নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে সেগুলি প্রত্যর্পিত হলেও আর পাওয়া যায়নি। মন্দিরটি পালপাড়ার রাজা সোমেশ্বরের বংশধর গন্ধর্ব রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব'লেও জনশ্রুতি। কৃত্তিবাসের রামায়ণে আছে ঃ

"গন্ধর্বরায় বসে গন্ধর্ব অবতার।
রাজসভা পূজিত সে গৌরব অপার ॥"

কৃত্তিবাস গৌড়রাজসভায় পদস্থ কর্মচারীরূপে গন্ধর্ব রায়কে দেখেছিলেন। তাঁর রামায়ণের রচনাকাল ১৪৬০ শক (১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ)। অতএব, এই কিংবদন্তী অনুসারে, মন্দিরটি তৎপূর্বে নির্মিত হওয়া উচিত। কিন্তু এ ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তার স্বপক্ষে যুক্তি আগেই দেখানো হয়েছে।

মন্দিরের পশ্চিম দিকে, অল্প দূরে, একটি মজা খাল আছে। সে খালটি চাকদহ থেকে পালপাড়া হয়ে শিমুরালির দিকে গিয়েছে। এটি গঙ্গার প্রাচীন খাত হলেও, প্রত্যুম্নসরোবর নামে স্থানীয়ভাবে পরিচিত। স্মার্ত রঘুনন্দন 'মুক্তবেণী'র অবস্থান নির্দেশ করতে গিয়ে প্রত্যুম্ননগরের নাম করেছেন। জনশ্রুতি, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রত্যুম্ন চক্রতীর্থে (চাকদহে) সিদ্ধিলাভ ক'রে নিজ নামে এখানে এক নগর স্থাপন করেন এবং আলোচ্য মন্দিরটি তাঁরই কীর্তি।

এখানকার ঢোলপুকুর নামে প্রাচীন পুষ্করিণীর পাড়ে একটি একচূড়, অষ্টকোণ, ভগ্ন মন্দির আছে। ইটের তৈরী সে মন্দিরের ছাদ ছত্রাকৃতি। অধুনা পরিত্যক্ত এ মন্দিরটিতে একদা শিবলিঙ্গ ছিল। পোড়ামাটির সজ্জা নেই। পাশেই এক বাঁধানো ভগ্ন ঘাট দেখা যায়।

তা ছাড়া, এখানে আরও দুটি অলংকরণবিহীন আটচালা-শিবমন্দির আছে যেখানে নিত্যপূজা এখনও অব্যাহত। এগুলি রামমোহন সাবর্ণ-চৌধুরী কর্তৃক শকাব্দ ১৭৬০, বঙ্গাব্দ ১২৪৫ সনে (১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে), নির্মিত ব'লে মন্দিরে উল্লেখ আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের পারিষদ মহেশ পণ্ডিতের সমাধিও এখানে অবস্থিত।

স্থানীয় কাজীপাড়ায় অবস্থিত কাজীবাড়িটিও বেশ প্রাচীন। এই এলাকার পুরাতন নাম পাজনৌর বা পাঁচনুর। জনৈক হজরত শাহ্ আদম শহীদ নাকি কাজীপাড়ার প্রতিষ্ঠাতা। এখানে তাঁর 'মাজার' (সমাধি) ও একটি ছোট মসজিদ আজও বর্তমান। কাজীবংশের মুন্সী এতেমুদ্দিন মহম্মদ মরহুমের সময়ে নির্মিত কাজীবাড়িতে কয়েকটি মহল এবং সেগুলিতে যাতায়াতের জন্য নানা পথ ও উপপথ আছে। হলঘর ও নাচঘর আজও সনাক্ত করা যায় যদিও অট্টালিকাটি বর্তমানে জরাজীর্ণ এবং অনেকাংশ ভগ্ন।

পালপাড়ায় এক সময় প্রখ্যাত পণ্ডিত সমাজের বাস ছিল। এখানকার ন্যায়টীকাকার লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন রামমোহনের তান্ত্রিক গুরু ও হরিহরানন্দ অবধূত (নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার) ছিলেন তাঁর বন্ধু। লক্ষ্মীনারায়ণের অপর পুত্রদ্বয় ছিলেন বাংলাভাষায় প্রথম বাংলা অভিধানকার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও পণ্ডিত রামধন বিদ্যালঙ্কার। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির সভাপণ্ডিত শ্রীধর সার্বভৌমের বাড়িও ছিল পালপাড়ায়।

পালপাড়ায় অনেক ভগ্ন ও ভগ্নপ্রায় পুরাতন ইমারত, দেবালয় এবং গৃহাদি দেখা যায়। অধিকাংশই পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ। সেগুলি থেকেই এখানকার প্রাচীনত্ব অনুমিত হয়। এ ছাড়া এখানে কয়েকটি ঢিপিও আছে, কিন্তু অদ্যাবধি সেগুলিতে কোন খননকার্য চালানো হয়নি। রাজ্য পুরাতত্ত্ব অধিকারের পক্ষ থেকে সত্যকারের বৈজ্ঞানিক প্রথায় খননকার্য চালানো সম্ভব হলে, পালপাড়া অঞ্চলে বহু পুরাবস্তুর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

নিকটবর্তী মনসাপোতা গ্রামটি প্রাচীন। সেখানে এক জনপ্রিয় মনসা দেবীর থান আছে।

ফুলিয়াঃ শান্তিপুর থানার অন্তর্গত এবং শান্তিপুর শহর থেকে ৪ মাইল (৬·৪ কি. মি.) দক্ষিণ-পূর্বে ও রাণাঘাট শহর থেকে ৯ মাইল (১৪·৫ কি. মি.) উত্তর-পশ্চিমে ভাগীরথীর নিকটবর্তী প্রাচীন গ্রাম। আধুনিক উপনগরী ফুলিয়া ৩৪নং জাতীয় সড়কের সন্নিহিত পশ্চিমে হলেও, সাবেক ফুলিয়া গ্রামটি ওই সড়কের দক্ষিণে, ইটবাঁধানো পাকা পথে, ½ মাইল (০·৮ কি. মি.) দূরে অবস্থিত। রাণাঘাট-শান্তিপুর রেলপথের ফুলিয়া স্টেশনে নেমেও সেখানে যাওয়া যায়।

বাংলা রামায়ণকার, বাংলার আদিকবি কৃত্তিবাস ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে ফুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রামায়ণে আছেঃ

"ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস গায় সুধা ভাণ্ড।
রাবনেরে মজাইতে বিধাতার কাণ্ড॥
*
স্থানের প্রধান যে ফুলিয়ায় নিবাস।
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ॥
*
গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিনী॥"

কৃত্তিবাসের সময় ফুলিয়া ভাগীরথীতীরবর্তী ছিল। এখন গঙ্গা ফুলিয়া থেকে প্রায় ৪ মাইল (৬·৪ কি. মি.) পশ্চিমে সরে গেছে।

এখানে এক প্রাচীন বটবৃক্ষের নীচে ভাঙা ইটের স্তূপ কৃত্তিবাসের দোলমঞ্চ নামে পরিচিত। কৃত্তিবাসের জন্মভিটা ব'লে বর্ণিত স্থানটি চারপাশের জমি থেকে কিছুটা উঁচু। প্রায় ৬০ বছর আগে এখানে মর্মর-আচ্ছাদিত যে কৃত্তিবাস-স্মৃতিস্তম্ভটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তার সামনের বিস্তৃত মাঠে প্রতিবৎসর কৃত্তিবাস-স্মরণোৎসব, রামায়ণ-প্রদর্শনী ও রামায়ণগান প্রভৃতি হয়ে থাকে। কৃত্তিবাস-স্মৃতিস্তম্ভের লিপিটি নিম্নরূপঃ

"মহাকবি কৃত্তিবাসের
আবির্ভাব-১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দ, মাঘ মাস, শ্রীপঞ্চমী, রবিবার
হেথা দ্বিজোত্তম
আদি কবি বাঙ্গালার ভাষা রামায়ণকার
কৃত্তিবাস লভিলা জনম,
সুরভিত সুকবিত্বে ফুলিয়ার পুণ্যতীর্থে
হে পথিক, সম্ভ্রমে প্রণম।

শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী কর্তৃক ভিত্তি স্থাপিত হইল। ২৭ চৈত্র ১৩২২ বঙ্গাব্দ।”

এই স্মৃতিস্তম্ভের অদূরে শ্রীচৈতন্যগতপ্রাণ যবন হরিদাস ঠাকুরের সাধনপীঠ। নিকটেই একটি মাটির কুটীর হরিদাসের ‘ভজন গোফা’ নামে পরিচিত। সেখানকার একটি বৃক্ষমূলের বেদী হরিদাসের নাম-জপের স্থান ব’লে পরিচিত। অদূরে কৃত্তিবাসের সমাধি। হরিদাসের সাধনপীঠ পরম বৈষ্ণবতীর্থ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে যাওয়ার পূর্বে এখানে এসে হরিদাসের সাধনপীঠে কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং ভক্তদের দর্শন দেন। কাছেই ছোট এক দালান-মন্দিরে বৈষ্ণবভক্ত জগদানন্দ গোস্বামী কর্তৃক স্থাপিত কৃষ্ণ, রাধিকা, বলরাম এবং রেবতীর চারটি মূর্তি আছে। দোলপূর্ণিমার সময় তাঁদের দোল-উৎসবে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

ফুলিয়ায় এক সময় বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস ছিল।

বড়গাছি ঃ নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত ও ৩৪নং জাতীয় সড়কের পাশে গাছা গ্রাম থেকে কাঁচা রাস্তায় ৮ মাইল (১২·৯ কি. মি.) উত্তর-পুবে অবস্থিত। কৃষ্ণনগর-করিমপুর বাসপথে হাঁটরা গ্রামে নেমে, মধ্যে জলঙ্গী নদী পার হয়ে, কাঁচা পথে ২ মাইল (৩.২ কি. মি.) পশ্চিমে এ গ্রামে পেঁীছানো যায়।

ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে আছে ঃ

“ধন্য ধন্য পরগণা বাগুয়ান নাম।
গাঙ্গিনীর পূর্বকূলে আন্দুলিয়া গ্রাম॥
তাহার পশ্চিম পারে বড়গাছি গ্রাম।
যাহে অন্নদার দাস হরিহোড় নাম॥”

এখানে হরিহোড় রাজার গড় ও প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ ব’লে পরিচিত একটি উঁচু ঢিপি আছে। গড়ের চারদিকে পরিখার চিহ্ন এখনও দেখা যায়।

নদীয়ারাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের পূর্বনাম দুর্গাদাস সমাদ্দার। তাঁর নিবাস ছিল বাগুয়ানে এবং তাঁর পিতা রামচন্দ্র সমাদ্দারের বাড়ি ছিল আন্দুলিয়া গ্রামে। আন্দুলিয়া জলঙ্গীর পূর্ব তীরে বড়গাছির সামান্য দূরে অবস্থিত। দেবী অন্নদা হরিহোড় রাজাকে পরিত্যাগ ক’রে রামচন্দ্রের গৃহে যাবার পর থেকে তাঁদের সমৃদ্ধি আরম্ভ হয় এবং পরে তাঁর পুত্র নদীয়ারাজ হন (১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ)। হরিহোড়ও একদা অন্নদার কৃপালাভ ক’রে রাজা হয়েছিলেন। জনশ্রুতি,

'লক্ষ্মীজোলা' নামে প্রাচীন খালটি দিয়েই ঈশ্বরী পাটনী দেবী অন্নদাকে জলঙ্গী ('অন্নদামঙ্গলে' 'গাঙ্গিনী' বলে উল্লিখিত) পার ক'রে দিয়েছিলেন। হরিহোড়ের গড়ের কাছে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আশ্রমবাড়ি। বড়গাছি বৈষ্ণবদের অন্যতম শ্রীপাট। শোনা যায়, শ্রীগৌরাঙ্গ একদা এ গ্রামে এসেছিলেন। আশ্রমবাড়ির খড়ের চালাঘরে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ প্রভুর নিমকাঠের বিগ্রহ, পিতলের রাধাকৃষ্ণমূর্তি এবং একটি অষ্টধাতুর ক্ষুদ্র মূর্তি আছে। শেষোক্ত মূর্তিটি গোপালরূপে পূজিত হলেও, আসলে বিষ্ণুমূর্তি ব'লে মনে হয়। গৌরাঙ্গ বিগ্রহের পাদদেশে লেখা আছে—১১১১। এই পাটবাড়িতে 'ক্ষেমা বাবা' ও 'মা'-র সমাধি আছে। এঁরাই নাকি শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানকার একটি প্রাচীন দীঘি শ্বেতগঙ্গা নামে পরিচিত।

বড় চাঁদঘর : কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত এবং শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথের পলাশী স্টেশন থেকে পিচের শাখাপথে ৩ মাইল (৪·৮ কি.মি.) পুবে অবস্থিত। সে পথে বাস চলে।

এখানকার লোকদেবী যশোদায়িনী কষ্টিপাথরের চতুর্ভুজা দুর্গামূর্তি ও তাঁরই ধ্যানে নিত্যপূজিতা। মূর্তিটির উচ্চতা ১ ফুট ৩ ইঞ্চি (৩৮ সে.মি.), প্রস্থ ৮ ইঞ্চি (২০ সে.মি.)। এক অশ্বত্থবৃক্ষমূলের শিকড়ে সেটি জড়িয়ে আছে। তাঁর কোন মন্দির নেই; বৃক্ষমূল উঁচু করে বাঁধানো। জনশ্রুতি, কমললোচন নামে এক তান্ত্রিক স্বপ্নাদেশে স্থানীয় এক দীঘি থেকে মূর্তিটি উদ্ধার ক'রে প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকে বিগ্রহটিকে বনদুর্গা বা মঙ্গলচণ্ডী নামেও অভিহিত ক'রে থাকেন। বৈশাখ মাসের প্রতি মঙ্গলবার তাঁর বিশেষ পূজা হয়। দেবীর কাছে অনেকে মানত করেন এবং মানতের ছাগবলিও প্রচলিত। যশোদায়িনীর পূজা ও উৎসব সর্বজনীন। বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবারে এখানে এক বড় মেলা বসে।

স্থানীয় একটি প্রাচীন মসজিদও উল্লেখযোগ্য। বহুবার সংস্কারের ফলে সেটির নির্মাণকাল আন্দাজ করা শক্ত।

বনমালীপাড়া : চাকদহ থানার অন্তর্গত এবং চাকদহ-নিমতলা বাসপথে চাকদহ থেকে ৬ মাইল (৯.৭ কি.মি.) পুবে অবস্থিত।

১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে স্থানীয় এক মজা পুকুরের তলা থেকে কষ্টিপাথরের একটি প্রাচীন বিগ্রহ পাওয়া যায়। সেটি পদ্মাসনে উপবিষ্ট, চতুর্ভুজ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের ত্রিমূর্তি। পশ্চাৎপটে নভোচারী দুটি গন্ধর্বও ক্ষোদিত আছে। ৩ ফুট (৯২ সে.মি.) উচ্চতার এহেন

প্রাচীন ভাস্কর্য একান্তই বিরল। মূর্তিটি এখন গ্রামের বারোয়ারি-ঘরে রক্ষিত আছে। একই সময়ে ওই দীঘির জলতল থেকে নাকি পোড়ামাটির ঘট ও প্রস্তরীভূত কাঠ, হাড় ইত্যাদিও পাওয়া গিয়েছিল। দীঘিটি কোন লুপ্ত নদীর অংশ ব'লে জনশ্রুতি। এই এলাকায় কয়েকটি উঁচু ঢিপিও দেখা যায়।

বহিরগাছি ঃ নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত এবং শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথের মুড়াগাছা স্টেশন থেকে কাঁচা পথে ২ মাইল (৩·২ কি.মি.) পশ্চিমে অবস্থিত।

যশোহর জেলার সারল গ্রামের ছান্দর-বংশের কাঞ্জারী-গোষ্ঠীপতি কুমুদ ন্যায়বাগীশের পুত্র রঘুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ ছিলেন নদীয়ারাজ রুদ্র রায়ের গুরুদেব। তাঁর উত্তরপুরুষরাও নদীয়ারাজের গুরুগিরি করেছেন। এই বংশের পণ্ডিত রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার ছিলেন নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বৃত্তিভোগী এবং তাঁর গুরু। কৃষ্ণনগর থেকে সারল গ্রামের দূরত্বহেতু, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগরের সন্নিকটে, গঙ্গাতীরবর্তী বহিরগাছি গ্রামে, গুরুদেবের বাসোপযোগী অট্টালিকা, শিবলিঙ্গ স্থাপনের জন্য দ্বাদশটি পরস্পরসংলগ্ন শিবমন্দির, বিগ্রহস্থাপনোপযোগী দালান-দেবালয় প্রভৃতি নির্মাণ করিয়ে দেন। গঙ্গা এখন এ গ্রাম থেকে বহুদূরে, কিন্তু একদা গঙ্গার মূলপ্রবাহ ব'লে পরিচিত বর্তমানের মৃতকল্প নদী 'গুড়গুড়ে' গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত। এই বংশে ন্যায়শাস্ত্র-বিশারদ বহু পণ্ডিতের জন্ম হয়। 'দত্তকচন্দ্রিকা'কার পণ্ডিত রঘুমণি বিদ্যাভূষণ এই বংশের সন্তান।

বারোটি শিবমন্দিরের মধ্যে ইটের তৈরী একটি চারচালা-মন্দির এখনও বর্তমান। এ মন্দিরের গায়ে একদা নাকি প্রচুর পোড়ামাটির মূর্তি ও নকাশি অলংকরণ ছিল; কয়েকটি 'টেরাকোটা'-মূর্তি এখনও দেখা যায়। দেবালয়টি বহুবার নানাভাবে সংস্কার করা হয়েছে। গর্ভগৃহে প্রবেশের কাঠের কপাট দুটি একদা বহুলঅলংকৃত ছিল। মন্দিরের শিবলিঙ্গ নিত্যপূজিত। এই পণ্ডিতবংশের বিভিন্ন শরিকদের গৃহে তাঁদের কুলদেবতার বিগ্রহাদিও উপাসিত। তা ছাড়া তাঁদের সংগ্রহে তালপাতা ও তুলট কাগজে লেখা খণ্ডিত বা সম্পূর্ণ ন্যায়স্মৃতি-শাস্ত্রাদির অসংখ্য প্রাচীন পুঁথি ও সেগুলির চিত্রিত কাঠের আবরণ ('পাটা') আছে, যাদের পুরাবস্তু ব'লেই গণ্য করা উচিত।

বাগআঁচড়া ঃ শান্তিপুর থানার অন্তর্গত এবং শান্তিপুর থেকে ৬ মাইল (৯·৭ কি. মি.) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। শান্তিপুর রেল-স্টেশন

থেকে কাঁচা পথে বা ৩৪ নং জাতীয় সড়কসংলগ্ন দিগ্‌নগরের কাছে বালিয়াডাঙার মোড় থেকে পিচের শাখা-রাস্তায় সেখানে যাওয়া যায়। এক সময় গ্রামটি ভাগীরথীতীরবর্তী ছিল ; এখনও ভাগীরথী বেশী দূরে নয়। পাশেই ভাগীরথীর প্রাচীন খাত বর্তমানে 'গোপয়ার বিল' নামে পরিচিত। এই বিলের ধারে, এক চতুষ্কোণ উচ্চভূমির চার কোণে, একদা ইটের তৈরী চারটি মন্দির ছিল। তার তিনটি এখন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন ; চতুর্থটি ধ্বংসপ্রায়। এই পরিত্যক্ত আটচালা-মন্দিরটির উপরে এক বিরাট বট গাছ তার শিকরজাল চতুর্দিক থেকে নীচে প্রসারিত করায় উপরের চালাটি লুপ্ত হয়েছে, দেওয়ালেও বড় বড় ফাটলের সৃষ্টি হয়ে বহুস্থানে ভেঙেচুরে গিয়েছে। এ দেবালয়ের তিনটি আলোকচিত্র পূর্ব-রেলপথ কর্তৃক ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বাংলায় ভ্রমণ' নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত আছে। সেগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, মন্দিরটির পুব ও দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে একদা পোড়ামাটির উৎকৃষ্ট মূর্তি ও নকাশি অলংকরণ নিবদ্ধ ছিল। খোদাই-করা ইটের প্রতিষ্ঠালিপিটি ছিল পুবের প্রবেশদ্বারের উপরে। এখন সেটি কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়মে রক্ষিত। তার পাঠ নিম্নরূপ ঃ

"শ্রীশিবঃ শাকে বারমতঙ্গবাণহরিণাঙ্কেনাঙ্কিতে শঙ্করং
সংস্থাপ্যাশুসুধা সুধাকরকরক্ষীরোদনীরোপমম্।
তস্মৈ সৌধমিদং মুদা সুজলদা নিলীনলোলধ্বজং
তৎপাদেরিতধীরধীরবিরতং শ্রীচাঁদরায়ো দদৌ ॥"

অর্থাৎ শিবপদে সততনিমগ্ন ধীরস্থির চাঁদ রায় ১৫৮৭ শকে (১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) শঙ্করকে স্থাপনা ক'রে চন্দ্রকিরণ ও দুগ্ধসমুদ্রতুল্য এই সৌধ সানন্দে তাঁকে দান করলেন। এই সৌধের শিরোভাগে স্থাপিত ধ্বজ সুনির্মল মেঘরাশিতে নিলীন হয়ে চঞ্চল হয়। এখানে 'বার' = ৭, 'মতঙ্গ' = ৮, 'বাণ' = ৫ ও 'হরিণাঙ্ক' = ১ ধ'রে 'অঙ্কের বামাগতি' অনুযায়ী প্রতিষ্ঠাকাল ১৫৮৭ শকাব্দ হয়েছে।

এ মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ে নদীয়ারাজ ছিলেন রাঘব রায়। রুদ্র রায় নদীয়ারাজ হন ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। চাঁদ রায় নাকি রুদ্র রায়ের দেওয়ান ছিলেন। ভারতচন্দ্রকৃত 'অন্নদামঙ্গলে' "প্রিয়জ্ঞাতি জগন্নাথ রায়— চাঁদ রায় ব'লে উল্লেখ আছে। বাংলার 'বারো ভুঁইয়া'র অন্যতম শ্রীপুরের চাঁদ রায়" ব'লেও অনেকে এই চাঁদ রায়কে সনাক্ত করেন। তাঁর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও উল্লিখিত মন্দিরের অদূরে দেখা যায়।

নদীয়ারাজ রুদ্র রায়ের নির্দেশে, চাঁদ রায় বাগআঁচড়ার নিকটে ১০৮ ঘর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বসবাস ও বিদ্যাচর্চার জন্য ভূসম্পত্তি দান ক'রে এক গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মণদের সুপ্রতিষ্ঠা হেতু সে গ্রামের নাম হয় ব্রহ্মশাসন। চাঁদ রায়ের নামানুসারে এ পল্লীটি চাঁদড়া বা চাঁছড়া নামেও পরিচিত। এই গ্রামের তান্ত্রিক পণ্ডিত চন্দ্রচূড় তর্ক-চূড়ামণি নদীয়ারাজ গিরীশচন্দ্রের সময়ে জগদ্ধাত্রীর সাকার মূর্তি প্রচার ও তন্ত্র থেকে তাঁর পূজাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেন। পরে, নদীয়ারাজের চেষ্টায়, জগদ্ধাত্রী পূজা সাধারণ্যে প্রচলিত হয়। ব্রহ্মশাসনেও একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে।

বাগআঁচড়ার প্রখ্যাত লৌকিক দেবী বাগ্‌দেবীর নামেই নাকি সে গ্রামের নামকরণ হয়েছে। শোনা যায়, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে, সাধক রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাগ্‌দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর কোনও মূর্তি নেই, ঘটেই পূজাদি হয়ে থাকে। সম্প্রতিকালে, 'গোপয়ার বিলে'র ধারে বাগ্‌দেবীর এক দালান-মন্দির নির্মিত হয়েছে। রঘুনন্দন এখানে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন ব'লে স্থানটি সিদ্ধাশ্রম হিসাবে চিহ্নিত। রঘুনন্দনের ভাগিনেয় মহাদেব মুখোপাধ্যায়ও এখানে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। রঘুনন্দন বা মহাদেবের অভিশাপেই নাকি চাঁদ রায় সবংশে নির্বংশ হন। বাগ্‌দেবী মন্দিরের কাছে রঘুনন্দনের বংশধরেরা এখনও বাস করেন। তাঁদের গৃহে চাঁদ রায় প্রতিষ্ঠিত শ্যামরায় বিগ্রহ ছাড়াও আর কয়েকটি কাঠ এবং ধাতুর দেবমূর্তি নিত্যপূজিত। প্রতিবছর ফাল্গুন মাসে বাগ্‌দেবীর মন্দিরপ্রাঙ্গনে এক মেলা বসে।

নিকটবর্তী করমচাপুলি গ্রামে একটি চারচালা-শিবমন্দির আছে। কোনও অলংকরণ নেই। শিবলিঙ্গ নিত্যপূজিত।

বাবলা : শান্তিপুর থানার অন্তর্গত এবং শান্তিপুর শহরসংলগ্ন গ্রাম। শান্তিপুর রেল-স্টেশন থেকে মাত্র ১ মাইল (১·৬ কি. মি.) দূরে অবস্থিত। সাইকেল-রিক্শ চলে। বৈষ্ণবতীর্থ বাবলা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভজনস্থান বা অদ্বৈতশ্রীপাট।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্টের লাউড় পরগণার নবগ্রামে অবির্ভূত হন। তাঁর পিতা কুবের আচার্য লাউড়রাজ দিব্যসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। অদ্বৈতের প্রকৃত নাম কমলাক্ষ। মাত্র বারো বৎসর বয়সে তিনি শান্তিপুরে বিদ্যাচর্চার জন্য আসেন। বেদসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে পারঙ্গম হয়ে তিনি বেদপঞ্চানন এবং অদ্বৈত-আচার্য উপাধিতে ভূষিত হন। শিক্ষান্তে, তিনি শান্তিপুরেই স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন।

বৈষ্ণবভক্তদের কাছে তিনি মহাবিষ্ণু এবং শিবের অবতাররূপে পূজিত। অদ্বৈতের আহ্বানেই নাকি নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হন। অদ্বৈতের বয়স তখন ৫২ বৎসর। 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' আছে ঃ

"অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার।
সেই প্রভু কহিয়াছেন বার বার॥"

বৈষ্ণবদের তিন প্রভু হলেন শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীঅদ্বৈতাচার্য। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের সাধনপীঠ ছিল একদা গঙ্গাতীরবর্তী এই নির্জন বাবলা গ্রামে। অদূরে গঙ্গার প্রাচীন খাত এখনও দেখা যায়। শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ বহুবার বাবলায় এসেছিলেন। বৈষ্ণব-গ্রন্থাদিতে বাবলায় তিন প্রভুর লীলাকাহিনীর সবিশেষ উল্লেখ আছে। শোনা যায়, অদ্বৈত আচার্যের বংশধর প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একদা হরিসঙ্কীর্তনের দল নিয়ে বাবলার শ্রীপাটে এলে, একটি কুকুরের ইঙ্গিতে তিনি এক স্থান খনন ক'রে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর 'কমলাক্ষ' নামাঙ্কিত কাষ্ঠ-পাদুকাদ্বয় ও কমণ্ডলু উদ্ধার করেন। সেগুলি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আসন-বেদীতে প্রোথিত আছে। সাধু সীতানাথদাস নামে শ্রীসম্প্রদায়ী এক বৈষ্ণব, ভিক্ষালব্ধ অর্থে এখানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর দালান-মন্দিরাদি নির্মাণ ক'রে তাঁর নিত্যপূজা প্রচলন করেন। সে মন্দিরে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর কাঠের বিগ্রহ, রাধাকৃষ্ণ, গোপাল ও নারায়ণশিলা আছেন। কাছেই, তিন প্রভুর স্মৃতিবিজড়িত একটি বেদীও দেখা যায়। শুক্লপক্ষের মাঘী সপ্তমী তিথিতে শ্রীঅদ্বৈতের আবির্ভাবদিবসে এবং দোলপূর্ণিমার পরবর্তী সপ্তমী তিথিতে বিশেষ উৎসবের সময় এখানে মেলাও বসে।

বামনপুকুর ঃ নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত এবং ৩৪ নং জাতীয় সড়ক থেকে নির্গত শ্রীমায়াপুর-হুলোরঘাট পিচের সড়কে বাসযোগে সেখানে যাওয়া যায়। স্থানটি মায়াপুরের অদূরে এবং কৃষ্ণনগর শহর থেকে ৮ মাইল (১২'৯ কি. মি.) পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার উল্লেখ্য পুরাকীর্তি, চাঁদ কাজীর সমাধি এবং বল্লালঢিপি।

চাঁদ কাজীর সমাধি বামনপুকুর বাজারের পাশে অবস্থিত। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জীবনীগ্রন্থাদিতে চাঁদ কাজীর বহু উল্লেখ আছে। শোনা যায়, চাঁদ কাজীর আসল নাম ছিল মৌলানা সিরাজুদ্দীন এবং তিনি গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের শিক্ষক ছিলেন। সংকীর্তন নিষিদ্ধ ক'রে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের সংকীর্তনে বাধা দেন এবং সংকীর্তনকারীদের খোল ভেঙে দেন। মহাপ্রভু তখন এক বিরাট নামকীর্তন দলের শোভাযাত্রা নিয়ে কাজীর বাড়ি যান এবং সংকীর্তন করতে থাকেন। শেষে কাজী

নত হয়ে চৈতন্যগতপ্রাণ হন। তাঁর সমাধির চারপাশ প্রাচীরবেষ্টিত। সমাধির উপরে দীর্ঘ শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বহুকাল আগেকার একটি গোলকচাঁপা গাছ আছে। লোকবিশ্বাস, গাছটি নাকি চাঁদ কাজীকে কবর দেওয়ার সময়েই লাগানো হয়েছিল এবং চার শ বছরেরও বেশী প্রাচীন। বস্তুতঃ, এত প্রাচীন গোলকচাঁপা গাছ পশ্চিমবাংলার আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের কাছে এই সমাধিস্থান এক পবিত্র তীর্থ। অদূরেই কাজীবাড়ির ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়।

বামনপুকুর বাজারের উত্তর-পশ্চিমে বল্লালঢিপি অবস্থিত। পুরাকীর্তি সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী স্থানটি সংরক্ষিত। প্রায় বর্গাকার মাটির স্তূপটির উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুট (৯·২ মি.) এবং দৈর্ঘ্যপ্রস্থ প্রায় ৪০০ ফুট (১২২ মি.)। ঢিপিটি পশ্চিম দিকে খাড়াই এবং উত্তর-পূর্ব দিকে ঢালু। পশ্চিমে ভাগীরথী বেশী দূরে নয়। সেজন্য পশ্চিমের বহু অংশ ভাগীরথীগর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে ব'লে মনে হয়। ঢিপির চারপাশে আয়ত ও বর্গাকার পুরাতন ইটের গাঁথনি এবং উপরে পাথরের ছোট ছোট টুকরো এবং নানা রকমের খোলামকুচি ছড়ানো দেখা যায়।

বাংলায় সেনরাজাদের আমল ১০৯৫ থেকে ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দ। বল্লালঢিপি সেনরাজ বল্লালসেনের প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ ব'লে অনুমিত। এই মৃত্তিকাস্তূপ থেকে একদা নানান কারুকার্যখচিত প্রস্তর ও স্তম্ভাদি কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এখানকার কাজীবাড়ি ও মোল্লাবাড়ি নাকি বল্লালঢিপি থেকে আহৃত ইট-পাথর দিয়ে নির্মিত। চাঁদ কাজীর সমাধিস্থানে কারুকার্যশোভিত প্রকাণ্ড দুই খণ্ড প্রস্তর ছিল ব'লে প্রকাশ। বর্তমানে সে দুটি অন্তর্হিত হলেও, বামনপুকুরের বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু কারুকার্যক্ষোদিত প্রস্তরখণ্ড এখনও দেখা যায়।

সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা দাক্ষিণাত্যভূপতি বীরসেনের বংশধর সামন্তসেন। তিনি বাংলার স্বাধীন রাজা ছিলেন। বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি থানার দেবপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত এক প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ বিজয়প্রশস্তি থেকে জানা যায়, রাজা সামন্তসেন বৃদ্ধ বয়সে পবিত্র গঙ্গাপুলিনে সুপরিসর পুণ্যাশ্রমনিচয়ে বাস করতেন :

"উদ্গন্ধীন্যাজ্যধূমৈর্মৃগশিশুরসিতাখিন্ন বৈখানসস্ত্রী-
স্তন্যক্ষীরাণি কীরপ্রকরপরিচিতব্রহ্মপরায়ণানি।
যেনাসেব্যন্ত শেষে বয়সি ভবভয়াস্কন্দিভির্মস্করীন্দ্রৈঃ
পুণ্যোৎসঙ্গানি গঙ্গাপুলিন পরিসরারণ্য পুণ্যাশ্রমাণি॥"

(Epigraphia Indica, Vol-1, p-308)

সামন্তসেনের নামানুসারে এই স্থানের নাম হয় সীমন্তদ্বীপ বা সামন্তদ্বীপ। পরে, প্রচলিত নাম হয় সিমুলিয়া। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেন যে, বল্লালঢিপি আসলে সামন্তসেনের প্রাসাদেরই ধ্বংসস্তূপ।

সামন্তসেনের পৌত্র প্রবলপরাক্রান্ত রাজা বিজয়সেন নবদ্বীপ অঞ্চলে গঙ্গাতীরে প্রাসাদাদি নির্মাণ করেছিলেন। বিজয়সেনের রাজপুরী ছিল বিজয়পুরে। বিজয়পুর কালক্রমে বেজপাড়া নামে পরিচিত হয়। 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত' গ্রন্থ অনুসারে, বিজয়পুর বা বেজপাড়া নবদ্বীপ ও বামনপুখরিয়ার (বামনপুকুর) মধ্যবর্তী স্থান। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অন্যতম অন্তরঙ্গ পারিষদ ও কড়চাকার মুরারি গুপ্তের বাড়ি ছিল বেজপাড়ায়। বেজপাড়া আজ আর নেই, গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। বল্লালঢিপি বিজয়সেনের বিজয়পুরীর ধ্বংসাবশেষ ব'লেও অনেকে মনে করেন।

ইতিহাসখ্যাত নৃপতি বল্লালসেন বিজয়সেনের পুত্র। তাঁর রাজপ্রাসাদ ছিল সামন্তদ্বীপ বা সিমুলিয়ায়। তিনি তাঁর জ্ঞানীগুণী সভাসদ্ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নবদ্বীপে বাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। ঘটকপ্রবর 'মুলো' পঞ্চাননকৃত 'গোষ্ঠীকথা'য় আছে ঃ

"মুক্তিহেতু বল্লাল আসিল গঙ্গাস্নান।
জহ্নুনগরোত্তরে করে যে বাসস্থান॥
নিজ সভাসদে দেন নবদ্বীপে ঘর।
যে ইচ্ছিল গঙ্গাবাস কিম্বা দ্বিজেতর॥
ক্রমে নবদ্বীপ হল বাণীর নিবাস।
পুণ্যতীর্থ বলি হৃদি সবার বিশ্বাস॥"

জহ্নুনগর একালের জান্‌নগর ; তার উত্তরে সিমুলিয়া অবস্থিত। বল্লালসেন বৃদ্ধ বয়সে 'অদ্ভুতসাগর' নামে একটি গ্রন্থরচনা আরম্ভ করেছিলেন। সে গ্রন্থ শেষ করেন তাঁর পুত্র লক্ষ্মণসেন। 'অদ্ভুতসাগর' থেকে উদ্ধৃতি ঃ

"শাকে খনবখেন্দ্বব্দে আরেভেঽদ্ভুতসাগরং
গৌড়েংদ্রকুঞ্জরালান স্তম্ভবাহুর্মহীপতিঃ॥
গ্রন্থেঽস্মিন্নসমাপ্ত-এব তনয়ং সাম্রাজ্যরক্ষামহা-
দীক্ষাপর্ব্বনি দীক্ষনান্নিজ-কৃতোর্নিষ্পত্তিমভ্যর্থ্য সঃ
নানাদানচিতাংবু সংচলনতঃ সূর্য্যাত্মজাসংগমং
গঙ্গায়াং বিরচয্য নির্জরপুরং ভার্য্যানুযাতো গতঃ॥"

এ থেকে জানা যায়, বল্লালসেন গঙ্গাতীরে নির্জনপুরে বাসকালীন ১০৯১ শকাব্দে, অর্থাৎ ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দে, পরলোকগমন করেন। সেজন্য, বল্লালঢিপি বল্লালসেনের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ হিসাবেই সমধিক পরিচিত।

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ীরচিত 'পবনদূত' থেকে জানা যায়, বিজয়পুরে উন্নত স্কন্ধাবারে লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল ("স্কন্ধাবারং বিজয়পুরমিত্যুন্নতাং রাজধানী")। অতএব, বল্লালঢিপি বল্লালসেনের স্কন্ধাবার বা সেনানিবাস ব'লেও অনুমিত হয়। বল্লালঢিপি কোন বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসস্তূপও হতে পারে। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন লিখিত বা 'পাথুরে' প্রমাণ নেই।

বল্লালঢিপির কাছে আরও কয়েকটি ঢিপি ও ইটের গাঁথনিবিশিষ্ট ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। মূল ঢিপিটির পশ্চিমে, গঙ্গার চরে, কিছু সীমানা-নির্ধারক ব'লে অনুমিত লৌহদণ্ড প্রোথিত আছে। উপযুক্ত যোগ্যতার সঙ্গে বল্লালঢিপির উৎখনন করা হলে, বহু মূল্যবান্ ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হবার সম্ভাবনা। কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ অবিলম্বে এ কাজটি হাতে নিলে একটি জাতীয় কর্তব্য পালন করবেন। বল্লাল-ঢিপিতে প্রাপ্ত পাথরের পদ্ম, জানালার অংশ ও পিতলের একটি দীপবাহিকামূর্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।

বামনপুকুর গ্রামে একাধিক পুরাতন মসজিদও দেখা যায়।

বার্নিয়াঃ তেহট্ট থানার অন্তর্গত এবং তেহট্ট থেকে প্রায় ৮ মাইল (১২·৯ কি. মি.) পশ্চিমে অবস্থিত। কৃষ্ণনগর-তেহট্টঘাট (দেবগ্রাম হয়ে) বাসপথে সেখানে যাওয়া যায়।

স্থানীয় এক প্রাচীন পুকুরের পাড়ে পাথরের একটি অলংকৃত আসন বা পাদপীঠ আছে। তার সামনের দিকের মাঝখানে গণেশমূর্তি ও চারদিকে অনেকগুলি সিংহমূর্তি উৎকীর্ণ। গ্রামপ্রান্তে, বিলের মধ্যে, পাথরের বহু ভগ্নমূর্তি এখনও প্রোথিত আছে ব'লে স্থানীয় লোকের বিশ্বাস। পার্শ্ববর্তী বরেয়া গ্রামে একটি পুকুর খনন করবার সময় বুদ্ধমূর্তি ব'লে অনুমিত কষ্টিপাথরের পদ্মাসীন একটি মূর্তি নাকি পাওয়া গিয়েছিল। জনশ্রুতি অনুসারে, নিকটবর্তী পলশুণ্ডা গ্রামটি বৌদ্ধযুগের, তবে সেখান থেকে অদ্যাবধি কোনও প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়নি।

বিরহীঃ হরিণঘাটা থানার অন্তর্গত এবং হরিণঘাটা থেকে ২ মাইল (৩·২ কি.মি.) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বিরহীবাজারে ৩৪ নং জাতীয়

সড়ক থেকে যে পিচের শাখাপথ ৩ মাইল (৪·৮ কি.মি.) উত্তর-পশ্চিমে শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথের মদনপুর স্টেশন অবধি গিয়েছে, তার বাঁ পাশে, বিরহীবাজার থেকে ¼ মাইল (০·৪ কি.মি.) দূরে, মদনগোপালের এক দালান-মন্দির আছে। মন্দিরের সামনে মজা নদী যমুনার তীরে পাতলা ইটে তৈরী এক জীর্ণ ঘাট দেখা যায়।

জনশ্রুতি, বহুকাল আগে এক বৈষ্ণব এখানে মদনগোপাল বিগ্রহের পূজা করতেন। পরে, নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পোষকতায়, মদনগোপালের বর্তমান দালান-মন্দিরটি নির্মিত হয়। বহুলসংস্কৃত এ দেবালয়টি অতএব প্রায় দু শ বছরের প্রাচীন। বর্তমানে মন্দিরে বংশীধারী মদনগোপাল [কাঁঠাল কাঠে তৈরী ও প্রায় ৩ ফুট (৯২ সে. মি.) উঁচু], রাধিকা [নিম কাঠে তৈরী ও উচ্চতায় প্রায় ২ ফুট (৬১ সে. মি.)], বলরাম, রেবতী ও জগন্নাথের কাঠের তিনটি ছোট মূর্তি, একটি শিবলিঙ্গ ও পাঁচটি শালগ্রামশিলা আছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মদনগোপালের সেবার জন্য নাকি ১৫০ বিঘা দেবোত্তর জমি দান করেছিলেন। মন্দিরের সামনে এক পুরানো বটগাছের নীচে একটি প্রাচীন প্রস্তরখণ্ড পড়ে থাকতে দেখা যায়।

ভাইফোঁটার দিন মদনগোপালের মন্দির-চত্বরে যে মেলা বসে তাতে পুরুষের থেকে স্ত্রীলোকের সমাগম হয় অনেক বেশী। পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও ভাইফোঁটা উপলক্ষে মেলা হয় না। সমবেত মহিলাদের মধ্যে যাঁদের সহোদর ভাই নেই অথবা ভাইফোঁটার দিন অনুপস্থিত, তাঁরা মদনগোপালের কপালে বা তাঁর উদ্দেশে ফোঁটা দিয়ে থাকেন। প্রিয়কে দেবতা ও দেবতাকে প্রিয় করবার এ এক অভিনব লৌকিক দৃষ্টান্ত। ব্রাহ্মণবংশীয়ারা পুরোহিতের মাধ্যমে মদনগোপালের কপালে ফোঁটা দেন; অন্যেরা তেল-হলুদ-সিঁদুর মেশানো ফোঁটা দেন গর্ভগৃহে প্রবেশদ্বারের দু পাশের দেওয়ালে। কাঠের দুয়ারটিতে সুন্দর মূর্তি ও ফুলকারি নকশাগুলি সবুজ রঙের প্রলেপে এখন শ্রীহীন।

গ্রামের বিরহী নামটি শুধু শ্রুতিমধুর নয়, তাৎপর্যমণ্ডিতও বটে। এ সম্পর্কে অনেক লোককাহিনী প্রচলিত। মদনগোপাল নাকি প্রথমে একক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। রাধার বিরহে কাতর মদনগোপালের স্বপ্নাদেশে, সামনের যমুনাতীরে রাধিকার এক কাঠের মূর্তি পাওয়া গেলে, মদনগোপালের পাশে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাধিকার জন্য মদনগোপালের বিরহ এবং তার নিরসনের কাহিনীকে ভিত্তি ক'রেই নাকি গ্রামের নাম হয় বিরহী। মতান্তরে, সহোদরার অভাবে শ্রীকৃষ্ণের

(এক্ষেত্রে মদনগোপালের) যে বিরহ তা থেকেই গ্রামের নামের উৎপত্তি এবং সে-বিরহ প্রশমনের জন্যই এ অঞ্চলের মহিলাসমাজ ভাইফোঁটার দিন তাঁকে ফোঁটা দেবার সুন্দর প্রথাটির প্রচলন করেছেন। ('দেখা হয় নাই' ঃ অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পৃঃ ২৪৯-৫০)।

মদনগোপালের মন্দিরের সামান্য পশ্চিমে, ইটের তৈরী এক মঙ্গলচণ্ডী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। দেবীর এখন কোন মূর্তি নেই ; একখণ্ড পাথর মঙ্গলচণ্ডীজ্ঞানে ও তাঁর ধ্যানে উপাসিত। শোনা যায়, সাবেক দেবীমূর্তি নাকি ছিল এক দস্যুর পূজিতা। দস্যু ধৃত হলে, সে মূর্তি সামনের যমুনাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়। শারদীয়া দুর্গাপূজার মধ্যের একদিন এ মন্দিরে আজও দেবী চণ্ডীর পূজা হয়ে থাকে। মন্দিরের কাঠের দুয়ার এখন প্রায় বিনষ্ট হলেও, একদা নকাশি খোদাই-কাজে অলংকৃত ছিল বোঝা যায়। মঙ্গলচণ্ডীর নামানুসারে বিরহীর পশ্চিমাংশের নাম চণ্ডীপাড়া।

বিল্বগ্রাম ঃ নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত এবং শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথের বেথুয়াডহরী স্টেশন থেকে অথবা ৩৪ নং জাতীয় সড়কস্থিত বেথুয়াডহরী গ্রাম থেকে শাখাপথে ৪ মাইল (৬'৪ কি.মি.) দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

পূর্বতন সমৃদ্ধির স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই প্রাচীন গ্রামটির প্রায় সর্বত্র পুরাতন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। গ্রামটি একদা গঙ্গাতীরবর্তী ছিল ; এখন ভাগীরথী ১½ মাইল (২'৪ কি.মি.) পশ্চিমে সরে গেছে।

এখানকার অধিষ্ঠাত্রী গ্রামদেবী হলেন বিলেশ্বরী। দুর্গামূর্তির অনুরূপ তাঁর প্রস্তরবিগ্রহ এক দালান-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। চৈত্র মাসে, বাসন্তী পূজার তিন দিন, বিলেশ্বরীর সর্বজনীন পূজা হয়। মানসিকের ছাগবলিও প্রচলিত। বছরের যেকোন সময়ে মানসিক পূজা দেওয়া যায়। দেবীর নিত্যপূজার জন্য দেবোত্তর ভূসম্পত্তি আছে। তাঁর মন্দিরে কয়েকটি শিবলিঙ্গ, একটি শীতলা এবং কয়েকটি মূর্তির ভগ্নাংশও দেখা যায়।

আর একটি দালান-মন্দিরে মদনমোহন নামে খ্যাত পাথরের বংশীধারী কৃষ্ণ ও অষ্টধাতুর রাধিকাবিগ্রহ উপাসিত। স্থানীয় পণ্ডিত কালিদাস সিদ্ধান্ত এই মন্দির ও বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা ব'লে শোনা যায়। মন্দিরটি পরে বহুবার সংস্কৃত হয়েছে।

একদা এখানে বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের বাস ছিল। এখানকার আদিপণ্ডিত বিষ্ণুদাস ঠাকুরের ২৯তম পুরুষ পণ্ডিত মদনমোহন

তর্কালঙ্কার এই গ্রামের সন্তান। সম্প্রতি তাঁর জন্মভিটায় একটি স্মৃতিস্মারক নির্মিত হয়েছে। প্রতিবৎসর ৩ জানুআরি তারিখে, মদনমোহনের জন্মদিনে, এখানে সভাদি হয়ে থাকে।

বিল্বপুষ্করিণী ঃ প্রচলিত নাম বেলপুকুর। কোতোয়ালী (কৃষ্ণনগর) থানার অন্তর্গত ও শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথের ধুবুলিয়া স্টেশন থেকে অথবা ৩৪নং জাতীয় সড়কস্থিত ধুবুলিয়া গ্রাম থেকে ৩ মাইল (৪·৮ কি. মি.) পশ্চিমে অবস্থিত।

গঙ্গাতীরবর্তী এই প্রাচীন গ্রামে নদীয়ারাজের পোষকতায় ভারতবিখ্যাত পণ্ডিতেরা একদা সংস্কৃত শাস্ত্রাদির চর্চা করতেন। এখানে তখন অনেকগুলি চতুষ্পাঠী ছিল।

'মহাবংশে' উল্লেখিত রত্নগর্ভের বংশধর পণ্ডিত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য নদীয়ারাজ রুদ্র রায়ের বৃত্তিভোগী ছিলেন। শোনা যায়, তিনি এখানকার এক পুষ্করিণীতীরের বিল্ববৃক্ষতলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন ব'লে গ্রামের নাম হয় বিল্বপুষ্করিণী। তৎকালীন নদীয়ারাজের নির্দেশে এখানে নাকি ১০৮টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার একটি ভিন্ন অন্য সবগুলি এখন লুপ্ত। তবে তাদের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়। বাচস্পতিপাড়ায় অবস্থিত, বর্তমান পশ্চিমমুখী শিবমন্দিরটিও বেশ জীর্ণ। সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির মূর্তি ও নকাশি অলংকরণযুক্ত এ দেবালয়টি আটচালা শ্রেণীর। দ্বিতীয় চালার উপরে, ত্রিশূলের দু পাশে, ক্ষুদ্র চূড়া আছে। আয়তাকার মন্দিরটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা, যথাক্রমে, ১৩ ফুট ৮ ইঞ্চি (৪.২ মি.), ১০ ফুট ৫ ইঞ্চি (৩·২ মি.) ও প্রায় ২৫ ফুট (৭.৬ মি.)। ভিত্তিবেদীর অনুভূমিক সারিতে ফুলকারি নকশা ও হংসপঙ্‌ক্তি এবং প্রবেশদ্বারের দু পাশের দেওয়ালে দশাবতার, কৃষ্ণলীলা, ব্রহ্মা, শিব, কালী, কার্তিক, গণেশ, বিশ্বকর্মা, নারদ, গরুড়, হনুমান প্রভৃতির মূর্তি এবং অল্প কিছু সামাজিক ও রামায়ণের দৃশ্য দেখা যায়। দক্ষিণ দেওয়ালে কয়েকজন নরনারীর একটি মিথুনমূর্তি উৎকীর্ণ আছে। নিরলংকার দক্ষিণের দেওয়ালে এহেন একটিমাত্র মূর্তি সংযোজনের রীতিটি হুগলী জেলার কোন কোন অঞ্চলেও প্রচলিত। এ দেবালয়ে কোন প্রতিষ্ঠাফলক নেই। তবে শোনা যায়, নদীয়ারাজ রুদ্র রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় পণ্ডিত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। শিবলিঙ্গটি এখনও নিত্যপূজিত।

এ মন্দিরের কাছে প্রাচীন ইঁটের তৈরী এক আটচালা-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সেখানে কয়েকটি শিবলিঙ্গ আছে। অদূরে

বৃক্ষতলে ও দালান-মন্দিরাদিতে যে আরও কয়েকটি শিবলিঙ্গ আছে, সেগুলি নাকি বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত শিবমন্দিরগুলি থেকে আনীত। এ ছাড়া, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবীর পূজার জন্য প্রাচীন ইটের তৈরী কয়েকটি পূজার দালানও এখানে বিদ্যমান। গ্রামপ্রান্তের অশ্বত্থবৃক্ষতলে পঞ্চমুণ্ডীর আসনটি ইটের। রামচন্দ্র ভট্টাচার্য নাকি সেখানেই সিদ্ধিলাভ করেন।

রাঘবেন্দ্রের বংশধর, স্থানীয় অপর পণ্ডিতবংশের মহামহোপাধ্যায় দেবীপ্রসন্ন স্মৃতিভূষণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে, তার পরিবর্তে নতুন এক একচূড়-মন্দির নির্মিত হয় এবং সেখানে শিবলিঙ্গটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বিষ্ণুপুর ঃ চাকদহ থানার অন্তর্গত ও চাকদহ রেল-স্টেশন থেকে চাকদহ-বনগাঁ পিচের সড়কে ৬ মাইল (৯.৭ কি. মি.) পুবে অবস্থিত। এ পথে নিয়মিত বাস চলে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুরু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী একদা এখানে বাস করতেন। অদ্বৈতাচার্যও এক সময়ে তাঁর কাছে ছিলেন। জনশ্রুতি, পুরাকালে এখানেই নাকি সপ্তমুনির আশ্রম ছিল।

জগন্নাথ বিগ্রহের একটি দালান-মন্দির স্থানীয় দ্রষ্টব্য। জনৈক বিষ্ণুদেব শর্মা সেটির প্রতিষ্ঠাতা। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় জগন্নাথের সেবাপূজার জন্য ১১৬৫ সালের ৭ মাঘ তারিখে ৭২ বিঘা ১১ কাঠা ভূমি দান করেন। এ দেবালয়ে কাঠের জগন্নাথ, রাধাবল্লভ ও রাধারাণীর মূর্তি আছে। তা ছাড়া কষ্টিপাথরের ১½ ফুট (৪৬ সে.মি.) উঁচু ও ৮ ইঞ্চি (২০ সে.মি.) চওড়া একটি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বাসুদেবমূর্তিও গর্ভগৃহে রক্ষিত। পিতলের অন্যান্য ছোট ছোট বিগ্রহ —দ্বিভুজা মঙ্গলচণ্ডী, বরুণদেব, নাড়ুগোপাল, মনসাদেবী, গণেশ এবং পদ্মপাণি ইন্দ্র (বুদ্ধমূর্তি বলে অনুমিত)। চার আকারের চারটি শিবলিঙ্গও এখানে উপাসিত। এ দেবালয়ের কাছে আর একটি ছোট দালান-মন্দিরে এক প্রাচীন শিবলিঙ্গ আছে। বর্তমানে এ গ্রাম নেউলিয়া নামেও পরিচিত।

বিষ্ণুপুর ঃ কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত। কৃষ্ণনগর-খালবোয়ালিয়া বাসপথে, খালবোয়ালিয়ায় নেমে, কাঁচা রাস্তায় ৪ মাইল (৬·৪ কি. মি.) দূরে অবস্থিত।

এখানকার প্রায় তিন শ বছরের প্রাচীন লৌকিক দেবতা হরিঠাকুরের থান প্রসিদ্ধ। তাঁর ধ্যান ঃ

"উন্মত্তবেশং করপক্ষজভ্যাংধৃতং লগুড়ং পরশুঞ্চপালম্।
আঘূর্ণিত নেত্রং স্ফুরিত সুকান্তং ভজ্জে সুবৃত্তং হরিপাললাখ্যম্॥"

হরিঠাকুরের স্বপ্নাদেশ অনুসারে তাঁর কোন মন্দির নেই। প্রতিবছর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের প্রথম মঙ্গলবারে, পাটকাঠি ও খেজুর-পাতার তৈরী ঘরে মাটির বেদীর উপর তাঁর মূর্তি স্থাপন ক'রে পূজা করা হয়। প্রতিবারই নতুন মূর্তি গড়া হয় কিন্তু পুরানোটি বিসর্জন দেওয়া হয় না। হরিতলাতেই সেসব পুরাতন মূর্তি ক্ষয়ে নষ্ট হয়। হরিঠাকুর ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট; তাঁর ডান হাতে চাবুক, বাঁ হাতে লাগাম। পূজার এক মাস আগে থেকে প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামের কোন-না-কোন বাড়িতে হরিলুট হয় ও স্থানীয় হরিসংকীর্তনের দল খোলকরতাল নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে হরিতলায় গিয়ে গান শেষ করেন। পূজার দিন অষ্টপ্রহর হরিসঙ্কীর্তন ও হরিলুট হয়। এ দেবতার পূজা দিনমানে শেষ করাই বিধি।

১৩৩০ সালে স্থানীয় মোকামতলার মাঠে, এক জঙ্গলের মধ্যে, গ্রামের বীরভদ্র ঘোষ অষ্টধাতুর একটি বিষ্ণুমূর্তি পান। গ্রামবাসীরা তাঁর নাম দেন 'অনন্তদেব'। পরে, ১৩৪৫ সালে, সেই স্থানে ছোট এক চারচালা-মন্দির নির্মিত হয়। অনন্তদেব মূর্তিটি বর্তমানে অপহৃত। তাঁর মন্দিরে এখন, বিকল্পে, শিবলিঙ্গ ও কালীর ঘট ইত্যাদির নিত্যপূজা হয়।

বিষ্ণুপুরের সংলগ্ন গ্রাম দিগম্বরপুরে একদা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের বাস এবং বিদ্যাচর্চার জন্য বহু টোল ছিল। পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার এই গ্রামের সন্তান। এখানে পাতলা ইটের তৈরী এক জীর্ণ আটচালা-মন্দির আছে। আগে নাকি সেটিতে পোড়ামাটির অলংকরণ ছিল। সংস্কারের ফলে এখন সেগুলি লুপ্ত। দক্ষিণমুখী এ দেবালয় ভিত্তিবেদীর উপর স্থাপিত এবং দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায়, যথাক্রমে, ১৩ ফুট ৪ ইঞ্চি (৪·১ মি.), ১১ ফুট ৪ ইঞ্চি (৩·৫ মি.) ও প্রায় ২৫ ফুট (৭·৬ মি.)। প্রতিষ্ঠাফলক নেই। জনশ্রুতি, এ গ্রামের জমিদার শ্রীপতি রায় দু শ বছর পূর্বে নাকি মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরে নিত্যপূজিত কষ্টিপাথরের রাধাবল্লভ (বংশীধারী কৃষ্ণ), অষ্টধাতুর রাধিকা, পিতলের জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী ও ষষ্ঠী এবং পাথরের একটি খুব সুন্দর জয়দুর্গামূর্তি আছে। এ দেবালয়ের পশ্চিমে ইটের তৈরী এক মন্দিরের পাদপীঠের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

নীলবিদ্রোহে এই গ্রামের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

বীরনগর ঃ রাণাঘাট থানার অন্তর্গত এবং শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথের বীরনগর স্টেশনসংলগ্ন পৌরশহর।

বীরনগরের প্রাচীন নাম উলা। একদা এ গ্রাম ভাগীরথীতীরবর্তী ছিল; গঙ্গার প্রাচীন খাত এখনও অদূরে দেখা যায়। 'উলা' নামকরণ সম্পর্কে নানান লোকশ্রুতি আছে। উলুবনের চরভূমিতে প্রথম বসতি হলে নাম হয় উলা। ফারসী 'আউল' অর্থাৎ জ্ঞানী অথবা আরবী 'উলা' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ থেকেও উলা নাম হতে পারে। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে উলার উল্লেখ আছে। সম্রাট আকবরের আমলে উলা ছিল সরকার সুলেইমানাবাদের ৩২ মহালের অন্যতম। ১৪৬৬ শকে (১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে) প্রণীত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য এবং লোকশ্রুতি থেকে জানা যায়—শ্রীমন্ত সদাগর সপ্তডিঙা সাজিয়ে লঙ্কায় যাবার সময় উলার পাশে গঙ্গার দহে ভীষণ ঝড় ওঠে। সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। শ্রীমন্ত তীরে নেমে বটবৃক্ষমূলে শিলারূপিনী উলাইচণ্ডীর পূজা করলে ঝড় থেমে যায় এবং তাঁর সপ্তডিঙা রক্ষা পায়। সেই থেকে নাকি প্রতিবৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় ওই স্থানে উলাইচণ্ডীর পূজা হয়ে আসছে। উলাইচণ্ডীর নাম অনুসারেও উলা নাম হয়ে থাকতে পারে।

এখানে একদা গ্রামবাসীদের চেষ্টায় এক দুর্ধর্ষ ডাকাতদল ধৃত হলে, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার উলার নতুন নামকরণ করেন বীরনগর অর্থাৎ বীরদের নগর।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ম্যালেরিয়া মহামারীতে বীরনগর প্রায় জনশূন্য হয়। এখানকার পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত বহু প্রাচীন মন্দির ও সুরম্য অট্টালিকার জঙ্গলাকীর্ণ ধ্বংসস্তূপ এক উজ্জ্বল অতীতের নীরব সাক্ষী। এক সময়ে এখানে নাকি ৭টি পৃথক ঠাকুরবাড়িতে ২১টি মন্দির ছিল; এখন সেগুলির অধিকাংশই লুপ্ত।

উলা-সমাজের শীর্ষস্থানীয় মুস্তৌফীবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামেশ্বর মিত্র মুর্শিদকুলী খাঁর শাসনকালে বাংলার নায়েব-কানুনগো বা মুস্তৌফী পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বসতবাড়ির কাছে রাধা-কৃষ্ণের একটি সুন্দর জোড়বাংলা-মন্দির নির্মাণ করেন। তার সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির জীর্ণ ফলকে উৎকীর্ণ লিপিটির পাঠ নিম্নরূপ :

"অঙ্গৈককালেন্দুমিতে
শকাব্দে ১৬১৬ কায়
স্থ কায়স্থ হরেষধ
র্ম্মাঃ। যো নির্ম্মমে শ্রীহ
রি যুগ্মধাম
রামেশ্বর মিত্র দাসঃ॥"

অর্থাৎ ১৬১৬ শকাব্দে (১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে) কায়স্থকুলোদ্ভব শ্রীরামেশ্বর মিত্র শ্রীহরির এই যুগ্মগৃহ নির্মাণ করলেন। এখানে 'অঙ্গ'=৬, 'এক'=১, 'কাল'=৬ ও 'ইন্দু'=১ ধ'রে 'অঙ্কের বামাগতি' নিয়ম অনুযায়ী ১৬১৬ শকাব্দ হয়েছে। মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ নিত্যপূজিত। ভিত্তিবেদীর উপর স্থাপিত, পশ্চিমমুখী এ মন্দিরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা, যথাক্রমে ২২ ফুট (৬·৭ মি.), ২২ ফুট (৬·৭ মি.) ও প্রায় ২৫ ফুট (৭·৬ মি.)। প্রতিটি দোচালার প্রস্থ ১০½ ফুট (৩·৩ মি.) ও সংযোগকারী দেওয়ালের প্রস্থ ১ ফুট (৩১ সে.মি.)। প্রথম দোচালাটি অলিন্দ ; দ্বিতীয়টিতে গর্ভগৃহ।

'টেরাকোটা'-সজ্জা শুধু সামনের দেওয়ালে এবং গর্ভগৃহে প্রবেশ-দ্বারের তিন পাশে নিবদ্ধ। কারিগরি নৈপুণ্যে সেগুলি নদীয়া জেলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের তুল্য হলেও, সংস্কারের সময় সাদা বা গোলাপী কলিচুনে আবৃত হওয়ায় বেশ কিছুটা শ্রীহীন। বাইরের দেওয়ালে, ভিত্তিবেদীর অনুভূমিক সারিতে, পালকিবাহিত বাবু ও রক্ষকগণ, নৌকাভ্রমণ, সৈনিকদল, বাণিজ্যতরী, মৃগয়া প্রভৃতি সামাজিক দৃশ্য। বাইরের ত্রিখিলান প্রবেশপথের তিন দিক ঘিরে কুলঙ্গিতে নিবদ্ধ এক সারি মূর্তি-ভাস্কর্যের মধ্যে কৃষ্ণলীলা ও পৌরাণিক দেবদেবীই প্রধান। পূর্ণ ও অর্ধ-স্তম্ভগুলিও অলংকৃত। বাঁ দিকের পূর্ণ-স্তম্ভের গায়ে কার্তিক-গণেশসমেত মহিষমর্দিনীমূর্তিটি অপূর্ব। দেওয়ালের বাকী অংশে সূক্ষ্ম ফুলকারি নকশারই প্রাধান্য। গর্ভগৃহে প্রবেশদ্বারের প্রান্তেও অনুরূপ ফুলকারি সজ্জা আছে। সেখানে, খিলানশীর্ষের দু পাশে, প্রাচীন রীতির দুটি লম্ফমান সিংহ উচ্চ নৈপুণ্যের নিদর্শন।

মুস্তৌফীবাড়ির সিংহদ্বারের কাছে একদা কাঠের কারুকার্যশোভিত ও খড়ে-ছাওয়া এক দোচালা-চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। দক্ষিণমুখী এ মণ্ডপের অন্য তিন দিকে, চাল অবধি উঁচু দেওয়ালের ভিতরের সমতলে, পঙ্কের দেবদেবী মূর্তি ও ফুলকারি নকশা এখনও দেখা যায়। কাঠের থাম ও কড়ি-বরগাগুলির গায়ে ক্ষোদিত শিল্পকর্মের তুলনা হুগলী জেলার আঁটপুর ও শ্রীপুর-বলাগড়ের অপেক্ষাকৃত অক্ষত ও বিখ্যাত চণ্ডীমণ্ডপ দুটিতেও নেই। আদিতে চালের ভিতরের পৃষ্ঠে রঙিন বেতের সূক্ষ্ম কারুকার্য এবং অভ্র ও ময়ুরপুচ্ছের চন্দ্রকের আবরণ ছিল। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিনের ঝড়ে চালাটি বিধ্বস্ত হলে, টিনের চালা তৈরি করা হয়। কিছুকাল পূর্বে সেটিও নষ্ট হওয়ায়, কাঠের থাম ও কড়ি-বরগাগুলি এখন মুস্তৌফীবাড়িতে রক্ষিত আছে। কীটপতঙ্গের অত্যাচারে বহুদিন

আগে থেকেই সেগুলি অতিশয় জীর্ণ। এই অপূর্ব পুরাকীর্তিটির সংরক্ষণের জন্য কিছুমাত্র সরকারী বা বেসরকারী প্রচেষ্টা কখনই নিয়োজিত হয়নি। রামেশ্বর মিত্রমুস্তৌফী ১৬০৬ শকাব্দে (১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে) চণ্ডীমণ্ডপটি নির্মাণ করেন। মুস্তৌফীদের দুর্গাপূজা এখানেই সম্পন্ন হত। সে সময় নাকি বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে এই চণ্ডীমণ্ডপ দেখবার জন্য প্রচুর জনগমাগম হত। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও একদা এই চণ্ডীমণ্ডপের শোভা দর্শন করেছিলেন ব'লে শোনা যায়।

ভিত্তিবেদীর উপর স্থাপিত চণ্ডীমণ্ডপটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা ছিল, যথাক্রমে, ৩২ ফুট (৯·৮ মি.), ১৪½ ফুট (৪·৫ মি.) ও প্রায় ২০ ফুট (৬·১ মি.)। কাঠের থাম ও কড়ি-বরগাগুলিতে প্রচুর পদ্ম ও ফুলকারি নকশা ছাড়াও অসংখ্য দেবদেবীমূর্তি, সামাজিক দৃশ্য ও কিছু মিথুন-ভাস্কর্য ক্ষোদিত ছিল।

মুস্তৌফীবাড়ির সিংহদ্বারের সামনে, পুব দিকে, রামেশ্বর মিত্র-মুস্তৌফী প্রতিষ্ঠিত ইটের একটি প্রাচীন দোলমঞ্চ দেখা যায়। অদূরে, উত্তর দিকে, স্তম্ভশোভিত ইটের তৈরী কয়েকটি প্রাচীন দ্বিতল অট্টালিকা আছে। এগুলিই সাবেক মুস্তৌফীবাড়ি ব'লে পরিচিত।

বর্তমান মুস্তৌফীবাড়ির উত্তর-পূর্বদিকে একটি পুবমুখী, ভগ্ন, আটচালা-মন্দির দেখা যায়। অন্যত্র রক্ষিত এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ :

"শুভমস্তু শকাব্দাঙ্কেভূমিবিন্দু মহীপতৌ।
শ্রীকাশীশ্বর মিত্রেন বিষ্ণবেযৎ সমর্পিতম ॥"

এখানে 'ভূমি'=১, 'বিন্দু'=০, ও 'মহীপতি'=১৬ ধ'রে 'অঙ্কের বামাগতি' নিয়ম অনুসারে, প্রতিষ্ঠাকাল ১৬০১ শকাব্দ। রামেশ্বর মিত্রমুস্তৌফীর খুল্লতাত কাশীশ্বর মিত্র এই বিষ্ণুমন্দিরটি ১৬০১ শকে, অর্থাৎ ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে, বিষ্ণুপদে সমর্পণ করেন। উলার প্রতিষ্ঠাফলকযুক্ত যাবতীয় মন্দিরের মধ্যে এটিই সবচেয়ে প্রাচীন। আগাছা-আচ্ছাদিত দেবালয়টির উপরের চালা ও সামনের অংশের উপরিভাগ বিধ্বস্ত। সামনে ত্রিখিলানযুক্ত অলিন্দসমেত এ মন্দিরের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ১৮ ফুট (৫·৫ মি.) ও সাবেক উচ্চতা আনুমানিক ৩৫ ফুট (১০·৭ মি.)। অলিন্দের ছাদ 'ভল্ট্'-এর ও গর্ভগৃহের ছাদ কোণে লহরাযুক্ত গম্বুজের উপর স্থাপিত ছিল। প্রবেশপথের খিলানগুলির প্রান্তে ফুলকারি লতা ও দক্ষিণের দেওয়ালে খোপে নিবদ্ধ অনেকগুলি পদ্ম এখনও দেখা যায়। পোড়ামাটির অলংকরণ আগে হয়ত আরও বেশী ছিল।

রামেশ্বর মিত্রমুস্তৌফীর কনিষ্ঠপুত্র শিবরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র অযোধ্যারাম তাঁর বিধবা বালিকা কন্যা চাঁদরাণীর নিত্যপূজার জন্য দক্ষিণপাড়ায় দুটি আটচালা-শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালিপিতে আছে ঃ "শকাব্দা ১৭১২ / সন ১১৯৭" অর্থাৎ, ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ। বর্তমানে দেবালয় দুটি পরিত্যক্ত, জঙ্গলাকীর্ণ এবং ধ্বংসের মুখে। ৩ ফুট (০·৯ মি.) উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর স্থাপিত, পশ্চিমমুখী মন্দির দুটির দৈর্ঘ্যপ্রস্থ বর্গাকার—১৩ ফুট × ১৩ ফুট (৪ মি. × ৪ মি.) ও বর্তমান উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট (৬·১ মি.)। আগে এখানে কষ্টিপাথরের দুটি শিবলিঙ্গ ছিল ; এখন নেই। দেওয়ালে কিছু ফুলকারি নকশা ও কার্নিস থেকে প্রলম্বিত অলংকরণ ('ঝালট') ছাড়া অন্য কোন 'টেরাকোটা'-সজ্জা অনুপস্থিত।

দক্ষিণপাড়ায়, মুস্তৌফীবাড়ির পুবে, একদা যে সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরটি ছিল, তা এখন বিধ্বস্ত। রামেশ্বর মিত্রমুস্তৌফী এ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তিন কক্ষবিশিষ্ট, দক্ষিণমুখী এ দালান-মন্দিরে একদা ৪½ ফুট (১·৪ মি.) উঁচু কষ্টিপাথরের এক সিদ্ধেশ্বরী কালী প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। এখন সে বিগ্রহ অপসৃত। দেওয়ালে সামান্য কিছু পোড়ামাটির অলংকরণ আজও দেখা যায়। দক্ষিণপাড়ায় আর একটি লুপ্ত শিবমন্দিরের শুধু ভিত্তিবেদীটুকু অবশিষ্ট আছে। সেটি কোন্ শৈলীর দেবালয় ছিল তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও, আটচালা শ্রেণীর হওয়াই সম্ভব। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব'লে পরিচিত 'বুড়ো শিব' আজও সেই ভগ্ন ভিত্তিবেদীর উপরে নিত্যউপাসিত। শিবলিঙ্গটি লোঢ়া-কৃতি। তাঁর বিনষ্ট মন্দিরে 'টেরাকোটা'-অলংকরণ ছিল ব'লে শোনা যায়।

মুস্তৌফীবাড়ির উত্তর দিকে, দক্ষিণপাড়ায়, এক পঞ্চরত্ন-দেবালয় 'ব্রহ্মচারীদের শিবমন্দির' নামে পরিচিত। ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত, দক্ষিণমুখী, এ মন্দিরটির আয়তন ১৬ ফুট × ১৬ ফুট (৪·৯ মি. × ৪·৯ মি.) ও উচ্চতা প্রায় ২৫ ফুট (৭·৬ মি.)। বাইরের দেওয়ালে সামান্য কিছু পঙ্খের অলংকরণ আছে। মন্দিরে নিত্যপূজিত শিবলিঙ্গ ছাড়া একদা পিতলের দশভুজা দুর্গা, নৃসিংহ, রাধিকা ও কষ্টিপাথরের কৃষ্ণমূর্তি ছিল। শেষোক্ত বিগ্রহগুলি এখন নেই। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক অমরনাথ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেন ব'লে শোনা যায়।

রামেশ্বর মিত্রমুস্তৌফীর অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফী নীলের কারবারে বিপুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হন। উলার মুস্তৌফীবাড়ির উত্তর দিকে ৫০ বিঘা পরিমাণ জমির উপর তিনি নিজের সাতমহল

অট্টালিকা ও দ্বাদশমন্দির নির্মাণ এবং পুষ্করিণী খনন করান। সেই দ্বাদশমন্দির আজও বর্তমান। ঈশ্বরচন্দ্রের দৌহিত্র বৈষ্ণবচূড়ামণি ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর (কেদারনাথ দত্ত) এই বাড়িতে জন্মগ্রহণ করায়, তাঁর পুত্র শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত ৮-৬-১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরাদিসহ ১৬ বিঘা জমি ক্রয় করেন, মন্দিরাদি নতুনভাবে সংস্কার করেন এবং সেখানে এক গৌড়ীয় বৈষ্ণবমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বারোটি মন্দিরের দশটি আটচালা-শিবমন্দির, একটি দুর্গামন্দির ও অপরটি কালীমন্দির। শিবমন্দিরগুলির চারটি উত্তরমুখী, চারটি দক্ষিণমুখী এবং দুটি পুবমুখী। এ মন্দিরগুলির দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ৯ ফুট × ৯ ফুট (২·৭ মি. × ২·৭ মি.) ও উচ্চতা আনুমানিক ১৫ ফুট (৪·৬ মি.)। বর্তমানে মাত্র একটিতে শিবলিঙ্গ আছে। অন্যগুলি শিবলিঙ্গহীন। দুর্গামন্দিরটি বাংলার উচ্চতম দেবালয়গুলির অন্যতম। এক সময় এ দেবসৌধের মোট একুশটি চূড়ার পাঁচটি ক'রে ছিল প্রতি কোণে এবং মাঝখানে ছিল একটি অত্যুচ্চ চূড়া। বর্তমানে মূল চূড়াটি বাদে অন্যগুলি ভেঙে ফেলা হয়েছে। পর পর তিনটি পিতলের কলসের উপর সর্বোচ্চ চূড়ার ত্রিশূল স্থাপিত। মন্দিরগাত্রে কিছু উৎকৃষ্ট পঙ্খের কারুকার্য আছে। গর্ভগৃহে 'জগত্তারিনী' নামের অষ্টধাতুনির্মিত এক সিংহবাহিনী, দশভুজা, দুর্গামূর্তি ছিল। সেটি এখন শান্তিপুরের মতিগঞ্জের এক মন্দিরে 'জয়দুর্গা' নামে নিত্যপূজিতা। উলার 'জগত্তারিনী' মন্দিরের শ্বেতপাথরের প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ ঃ

"শ্রীশ্রীদুর্গা
শাকেঽঙ্কাগ্নিমহীধরেন্দুগণিতে মাসে তুলাস্থে রবৌ
গৌরীশ্রীশুভমন্দিরং দশভুজাখ্যাতা জগত্তারিণী।
মিত্রশ্রীশ্বর ঈশ্বরীপদসুধাপানোন্মত্তচিত্তালিকো
মধ্যে বেদ শিবালয়ং ভগবতীস্থানং পরং নির্ম্মমে ॥
১৭৩৯"

অর্থাৎ, ঈশ্বরীপদসুধা পান ক'রে যাঁর চিত্তরূপ মৌমাছি মত্ত হয়েছে, এমন শ্রীঈশ্বরচন্দ্র মিত্র ১৭৩৯ শকের কার্তিক মাসে (১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে) দশভুজা নামে খ্যাতা জগত্তারিণী গৌরীর শ্রীশুভমন্দির ও শিবালয়ের মধ্যে ভগবতীর পরমস্থান নির্মাণ করলেন জানবে। এখানে 'অঙ্ক' = ৯, 'অগ্নি' = ৩, 'মহীধর' = ৭ ও 'ইন্দু' = ১ ধ'রে 'অঙ্কের বামাগতি' নিয়মে প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৩৯ শকাব্দ। প্রস্তরফলকটি বর্তমানে এখানকার বৈষ্ণবমঠে স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত আছে।

এ মন্দিরের দক্ষিণে অবস্থিত কালীমন্দিরটির সাবেক পাঁচটি চূড়ার

মধ্যে চারটিই ভেঙে ফেলা হয়েছে। মন্দিরে দীনদয়াময়ী কালীর পাথরের মূর্তি ছিল। বর্তমানে সেটি বিসর্জিত। মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৫০ ফুট (১৫.২ মি.)। পশ্চিমমুখী এ মন্দিরের সর্বোচ্চ চূড়ার নীচে পোড়ামাটির টালিতে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠালিপিটি নিম্নরূপ ঃ

"শ্রীশ্রী কালী দিন দয়া
ময়ি সেবাইত শ্রী
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র মিত্র
পঞ্চরতন্ন সন ১২
২৫ সালে তৈয়ার
হয় মিস্ত্র তনু পণ্ডুয়া।"

অতএব, এ মন্দিরটি ঈশ্বরচন্দ্র ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেন। বর্তমানে মন্দিরটি পরিত্যক্ত। নদীয়ার যে দু একটি মন্দিরে মিস্ত্রীর নাম উৎকীর্ণ আছে এটি তাদের অন্যতম। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, মিস্ত্রীর সাকিন বা নিবাসের কোন উল্লেখ নেই। এ মন্দিরগুলি নিয়ে বৈষ্ণবমঠ প্রতিষ্ঠিত হবার পর, দুর্গামন্দিরের দ্বিতলে রাধিকামাধব কৃষ্ণমূর্তি ও রাধিকামূর্তিসহ গৌরগদাধর প্রভৃতি নিত্যপূজিত যে বিগ্রহগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলি প্লাসটারের তৈরী। কাছেই 'আনন্দ রায়' নামে খ্যাত কৃষ্ণের একটি আটচালা-মন্দিরও ঈশ্বরচন্দ্র নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমানে সেটি লুপ্ত।

দ্বাদশমন্দিরের কাছে, দক্ষিণ দিকে, পশ্চিমমুখী একটি দালান-মন্দির ছিল যেটিরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। পারিবারিক দুর্গাপূজা এই ঠাকুর-দালানেই অনুষ্ঠিত হত। দালানের ভিতরে ছিল কাঠের তৈরী এক চারচালা-মন্দির। সেটি মুস্তৌফীদের চণ্ডীমণ্ডপের মত দেবদেবী-মূর্তি ও কারুকার্য দ্বারা অলংকৃত ছিল। বর্তমানে সে দালান-মন্দির বা কাঠের চারচালার চিহ্নমাত্র নেই।

মুস্তৌফীবাড়ির উত্তর-পশ্চিম দিকে একজোড়া পরিত্যক্ত, পঞ্চচূড়-শিবমন্দির আছে। তাদের একটির অর্ধাংশ বিধ্বস্ত, অপরটিও জীর্ণ। উৎসর্গলিপিহীন এ মন্দির দুটি ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফীর বংশধর চিন্তামণি মিত্রমুস্তৌফী কর্তৃক আনুমানিক ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। সমান আকারের মন্দির দুটির আয়তন ১৬ ফুট × ১৬ ফুট (৪.৯ মি. × ৪.৯ মি.) ও উচ্চতা প্রায় ২৫ ফুট (৭.৬ মি.)। কার্নিস থেকে প্রলম্বিত সুন্দর সজ্জা ('ঝালট') ছাড়া অন্য 'টেরাকোটা'-অলংকরণ নেই।

উত্তরপাড়ায়, বাজারের পুব দিকে, এক পঞ্চচূড়, দক্ষিণমুখী শিব-মন্দিরে শিবলিঙ্গ নিত্যপূজিত। প্রবেশদ্বারের উপরে একটি গণেশমূর্তি

ছাড়া অন্য অলংকরণ নেই। পশ্চিম দিকের দেওয়ালে নিবদ্ধ পাথরের প্রতিষ্ঠালিপি অনুসারে ১৭৫৮ শকে বা ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক তারাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মন্দিরটি নির্মাণ করেন। প্রতিষ্ঠালিপিটি নিম্নরূপ ঃ

"ভাস্বদগাঙ্গকুলৈকসাগরভবঃ শুঙ্গঃ
শুভঃ শ্রীযুতস্তারাকান্ত উদেতি নিত্য
মনুজৈরুদ্দীপয়ন্তিঃ কুলং। ধন্যা
তজ্জননী জনিচ্ছিদিকৃতে প্রাসাদ
গং শাঙ্করংলিঙ্গং মঙ্গলভূতশৈলশশিমে
শাকে সমস্থাপয়ত্। মহাবিষুবদিনে
শকাব্দাঃ ১৭৫৮"

অর্থাৎ, দীপ্যমান গাঙ্গুলীবংশরূপ সাগর থেকে উদ্ভূত শুঙ্গ শ্রেণীর শুভ শ্রীযুত তারাকান্ত বংশকে সর্বদা উদ্দীপিত করেন এরূপ অনুজদের সঙ্গে আবির্ভূত হন। তাঁর জননী ধন্য। জন্মান্তরচ্ছেদ করবার জন্য ১৭৫৮ শকাব্দে মহাবিষুবদিনে (চৈত্রসংক্রান্তিতে) তিনি প্রাসাদ ও শিবলিঙ্গ স্থাপন করলেন। এখানে 'মঙ্গল' = ৮, 'ভূত' = ৫, 'শৈল' = ৭ এবং 'শশী' = ১ ধ'রে, 'অঙ্কের বামাগতি' নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠাবৎসর ১৭৫৮ শকাব্দ। গঙ্গোপাধ্যায়বংশীয়েরা মন্দিরসংলগ্ন প্রাচীন অট্টালিকায় বাস করেন।

উত্তরপাড়ায় একটি পরিত্যক্ত আটচালা-শিবমন্দিরও দেখা যায়। পশ্চিমমুখী সে মন্দিরে অলংকরণ বিশেষ নেই। প্রবেশদ্বারের উপরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়, মন্দিরটি জনৈক রূপনারায়ণ শর্মা ১৭৭৫ শকে (১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মাণ করেন। রূপনারায়ণের বিশদ পরিচয় অজ্ঞাত।

মাঝেরপাড়ায় এক আটচালা-শিবমন্দিরে এখনও নিত্যপূজা হয়। ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত, পূর্বমুখী এ মন্দিরের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ, যথাক্রমে, ১৩ ফুট (৪ মি.) × ১১ ফুট (৩.৪ মি.) এবং উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট (৬.১ মি.)। সামান্য অলংকরণ আছে। প্রবেশদ্বারের উপরে পোড়ামাটির প্রতিষ্ঠালিপি অনুসারে, হরচন্দ্র শর্মা ১৭৫৮ শকে (১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে) মন্দিরটি নির্মাণ করেন। প্রতিষ্ঠালিপিটি নিম্নরূপ ঃ

"কল্যাণ বাণ মুনি চন্দ্র মিতে শকাব্দে
পূর্ণে রবের্বিষুবসংক্রমনে শুভাহে
অস্থাপয়ত্ সুবিনতো হরচন্দ্র শর্ম্মা
লিঙ্গং ভবস্য ভবনঞ্চভবাপস্হতেঃ
১৭৫৮। সতাসরূপ মিস্ত্রী।"

অর্থাৎ, অত্যন্ত বিনীত হরচন্দ্র শর্মা ১৭৫৮ শকাব্দে সূর্যের বিষুব-সংক্রান্তির শুভদিনে জন্মান্তররোধের নিমিত্ত শিবলিঙ্গ ও তাঁর মন্দির স্থাপন করলেন। এখানে 'কল্যাণ' = ৮, 'বাণ' = ৫, 'মুনি' = ৭, এবং 'চন্দ্র' = ১ ধরা হয়েছে। হরচন্দ্র স্থানীয় পণ্ডিতসমাজের অন্যতম ছিলেন। নির্মাতা সত্যস্বরূপ (?) মিস্ত্রীর নামোল্লেখ বিশেষভাবে লক্ষণীয় কেননা নদীয়া জেলায় এটিই দ্বিতীয় মন্দির (অপরটির কথা আগেই বলা হয়েছে) যেখানে প্রতিষ্ঠালিপিতে কারিগরের নাম স্থান পেয়েছে। তার নিবাসের কোন উল্লেখ না থাকাটা পরিতাপের বিষয়। রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন জেলার বহু মন্দিরে কিন্তু রাজমিস্ত্রীদের সাকিন উল্লেখিত হয়েছে এবং সেই সূত্র থেকে মন্দির-গড়া কারিগরদের প্রধান কেন্দ্রগুলি কোথায় অবস্থিত ছিল তা জানা যায়। এ মন্দিরের অদূরে এক বিনষ্ট পূজার দালানের মাত্র চারটি থাম এখন অবশিষ্ট আছে।

মুখোপাধ্যায়পাড়ায় পাদপীঠযুক্ত, পুবমুখী, এক আটচালা-শিব-মন্দিরে শ্বেতপাথরের শিবলিঙ্গ নিত্যউপাসিত। এ মন্দিরের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ১৫ ফুট (৪.৬ মি.) × ১৩ ফুট (৪ মি.) ও উচ্চতা প্রায় ২৫ ফুট (৭.৬ মি.)। দেওয়ালে পোড়ামাটির কিছু মূর্তি ও নকাশি অলংকরণ আছে। প্রবেশদ্বারের উপরে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠালিপি থেকে দেখা যায়, উলার মুখোপাধ্যায়-বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাদেব মুখোপাধ্যায় ১৭১০ শকে (১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে) মন্দিরটি নির্মাণ করেন। অদূরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত পিতলের পাত-মোড়া কাঠের নবচূড়-রথটি রক্ষিত। সেটির কয়েক স্থানে পিতলের উপর মিনার কারুকার্য দেখা যায়। নিরেট পিতলের ঘোড়া দুটি বর্তমানে অপহৃত। রথযাত্রার সময় শ্রীধর নামের নারায়ণশিলা রথে প্রতিষ্ঠিত হন এবং তাঁর উৎসব সাতদিন ধ'রে চলে। মুখোপাধ্যায়বাড়িতে পাঁচটি প্রকাণ্ড স্তম্ভবিশিষ্ট এবং পঙ্খের কারুকার্যশোভিত একটি ভগ্ন দুর্গাদালানও আছে। খাঁপাড়ায় দেওয়ান কমলনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত, ভগ্ন, পরিত্যক্ত, পশ্চিমমুখী এক আটচালা-শিবমন্দিরের সামনের দেওয়ালে সামান্য অলংকরণ দেখা যায়। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত ব'লে অনুমিত। অদূরে দেওয়ান-বংশের কারুকার্যখচিত পূজার দালান এবং দ্বিতল অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ বর্তমান। কাছেই এক চারচালা-দোলমঞ্চ আছে। সেটি 'কচুইবনের দোলমন্দির' নামে পরিচিত। দোলপূর্ণিমার সময় সেখানে কৃষ্ণের দোল উৎসব অনুষ্ঠিত

হয়। দোলমঞ্চটি সুউচ্চ পাদপীঠের উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু কোন অলংকরণ বা প্রতিষ্ঠাফলক নেই।

খাঁপাড়ায় 'কলুপাড়ার মসজিদ' নামে পরিচিত তিন গম্বুজযুক্ত একটি প্রাচীন মসজিদ দেখা যায়। তার দেওয়ালের বাইরের দিকে দোচালা-কুটীরের প্রতীক ইটের টালিতে ক্ষোদিত আছে। অধুনা-বিধ্বস্ত এ মসজিদটি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল ব'লে শোনা যায়।

জনশ্রুতি, পলাশীযুদ্ধের বীর নায়ক মীরমদনের প্রাসাদ নাকি একদা এখানে অবস্থিত ছিল। এখন সে প্রাসাদের চিহ্নমাত্র নেই।

নদীয়ারাজ রাঘব রায় ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে উলায় এক বিরাট দীঘির মধ্যস্থলে পাকা দ্বিতল জলবাটিকা নির্মাণ করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও গ্রীষ্মকালে উলাইচণ্ডীর পূজা দিতে এসে এই বাটিকায় বাস এবং দীঘির পদ্মফুলে পূজাদি সম্পন্ন করতেন। জলবাটিকাটি বর্তমানে লুপ্ত। দীঘিটি 'খাঁ-দীঘি' নামে পরিচিত।

উলাইচণ্ডী উলার প্রখ্যাত লোকদেবী। তাঁর কোন মন্দির বা মূর্তি নেই ; কৃষ্ণবর্ণ, অসমান একখণ্ড পাথর রেল-স্টেশনের অদূরে প্রাচীন বটবৃক্ষমূলের বেদীতে স্থাপিত ছিল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সেটি অপহৃত হবার পর থেকে বেদীমূলেই পূজা চলে আসছে ("উলাচণ্ডী বিঘ্নখণ্ডী বটমূলে সংস্থিতা")। অক্ষয়কুমার সরকার মনে করেন, উলাইচণ্ডীর পূজা বৌদ্ধতন্ত্রের প্রকারভেদ মাত্র। নদীয়ারাজ রাঘব রায় উলাইচণ্ডী-পূজার নিয়মিত ব্যবস্থাদি ক'রে দেন ব'লে শোনা যায়। আগে, বৈশাখী পূর্ণিমায় প্রথমে হাড়ি জাতীয়েরা পূজা ও শূকর বলি দেবার পর নদীয়ারাজেরা, মুস্তৌফীরা এবং অন্যান্যেরা পূজা দিতেন। বর্তমানে এই নিয়ম রক্ষিত হয় না। বৈশাখী পূর্ণিমায় এখানে অনুষ্ঠিত মেলায় (বা 'জাত'-এ) একদা প্রায় দশ হাজার যাত্রীর সমাগম হত। একই সময়ে, স্থানীয় দক্ষিণপাড়ায় মহিষমর্দিনী এবং উত্তরপাড়ায় বিন্ধ্যবাসিনীর মৃন্ময়ী মূর্তির সর্বজনীন পূজা ও উৎসবাদি হয়ে থাকে।

ভাজনঘাট ঃ কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত ও রাণাঘাট-গেদে রেলপথের মাজদিয়া স্টেশন থেকে পিচের সড়কে ৪ মাইল (৬.৪ কি.মি.) দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত বাংলাদেশ সীমানার নিকটবর্তী প্রাচীন গ্রাম।

শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পারিষদ, বৈদ্যবংশীয় শ্রীকানু ঠাকুরের ('ঠাকুর কানাই') বংশধর ও 'স্বপ্নবিলাস', 'রাই উন্মাদিনী', 'বিচিত্রবিলাস' 'গন্ধর্ব্বমিলন', 'ভরতমিলন' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা এবং কীর্তন ও গীতিপদাবলীকার, ভক্তপ্রাণ কৃষ্ণকমল গোস্বামী এই গ্রামের সন্তান।

দীনেশচন্দ্র সেনের মতে—"বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরে কৃষ্ণকমলের ন্যায় পদকর্তা জন্মগ্রহণ করেন নাই।" বৈদ্যপ্রধান এই গ্রামে একদা বহু ভেষজচর্চা-পুস্তক এবং নিদানগ্রন্থ রচিত হয়েছে।

কৃষ্ণকমলের বংশের গৃহদেবতা বৃন্দাবনচন্দ্র কষ্টিপাথরের বংশীধারী কৃষ্ণ। প্রাচীন ইটে তৈরী এক দালান-মন্দিরে তাঁর সঙ্গে অষ্টধাতুর রাধিকা ও অন্যান্য বিগ্রহ উপাসিত। মন্দিরের সামনের থামগুলির শীর্ষে ইটের সামান্য অলংকরণ দেখা যায়। আর একটি দালান-মন্দিরে নিমকাঠের রাধাকৃষ্ণ ও 'ঠাকুর কানাই'-এর সংকীর্তনে ব্যবহৃত ব'লে কথিত এক খন্তি আছে। কৃষ্ণবিগ্রহের রাধাবল্লভ নামানুসারে মন্দিরটি রাধাবল্লভের মন্দির নামে পরিচিত। স্থানীয় বৈদ্যবংশের গৃহদেবী চণ্ডী। এক প্রাচীন দালান-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ঘট-এর প্রতীকে তাঁর নিত্যপূজা হয়। বহু জীর্ণ ও পরিত্যক্ত দ্বিতল অট্টালিকা এ গ্রামের পূর্ব সমৃদ্ধির স্মারক।

মাটিয়ারী ঃ কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত ও রাণাঘাট-গেদে রেলপথের বাণপুর স্টেশন থেকে কাঁচা রাস্তায় ½ মাইল (০.৮ কি.মি.) উত্তর-পূর্বে বাংলাদেশসীমান্তবর্তী প্রাচীন গ্রাম। কৃষ্ণনগর থেকে বাসেও যাওয়া যায়। কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহল-যাত্রাপ্রসঙ্গে এই গ্রামের উল্লেখ আছে।*

নদীয়া-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার নিকটবর্তী বাগোয়ান (বর্তমানে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত) গ্রাম থেকে তাঁর রাজধানী এখানে স্থানান্তরিত করেন। আদিশূর কর্তৃক আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম ভট্টনারায়ণের অধস্তন ২০তম পুরুষ ভবানন্দ। তাঁর পূর্বনাম ছিল দুর্গাদাস সমাদ্দার। তিনি এক সময়ে যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের অধীনে কর্মচারী ছিলেন এবং হুগলীর কানুনগোরূপেও কাজ করেছিলেন। প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে সাহায্য করায় মোগল সেনাপতি মানসিংহ ভবানন্দের প্রতি অতিশয় তুষ্ট হন এবং মানসিংহের সুপারিশক্রমেই জাহাঙ্গীর ১০১৫ হিজরীতে (১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁকে নদীয়া, মহৎপুর, লেপা, সুলতানপুর প্রভৃতি ১৪টি পরগণার জমিদারী ফরমান ও সম্মানসূচক 'মজুমদার' উপাধিদানে সম্মানিত করেন। এইভাবে বিরাট ভূসম্পত্তি ও রাজসম্মানের অধিকারী হয়ে ভবানন্দ মাটিয়ারী গ্রামে পরিখাবেষ্টিত এক রাজবাড়ি ও গড় নির্মাণ করেন। ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া-বরদা পরগণার রাজা শোভা সিংহের আক্রমণে বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের মৃত্যু

হলে, তাঁর পুত্র জগৎরাম ভবানন্দের পঞ্চম পুরুষ নদীয়ারাজ রামকৃষ্ণের সুরক্ষিত মাটিয়ারী রাজপ্রাসাদে আশ্রয় পান। বর্তমানে এ রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষমাত্র অবশিষ্ট আছে। এক সুবিস্তৃত উচ্চভূমির উপরে রাজবাড়িটি অবস্থিত ছিল। ইতস্ততঃ ইট ও পাথরের খণ্ড, গাঁথনির অংশ এবং একটি খিলানযুক্ত তোরণের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়। প্রাচীন এক বাঁধানো ঘাটের চিহ্নও চোখে পড়ে। পূর্বতন প্রাসাদ এলাকার অনেকখানি জুড়ে এখন চাষাবাদ হয়।

ভবানন্দের পৌত্র রাজা রাঘব রায় এখানে ১৫৮৭ শকে (১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) ইটের তৈরী অলংকরণযুক্ত, দক্ষিণমুখী এক চারচালা-মন্দির নির্মাণ করেন। সেখানে কৃষ্ণমর্মরনির্মিত 'রুদ্রেশ্বর' নামে শিবলিঙ্গটি এখনও নিত্যপূজিত। রাঘব তাঁর পুত্র রুদ্রের নাম অনুসারে শিবের নামকরণ করেছিলেন ব'লে শোনা যায়। সামনে অলিন্দবিহীন এ মন্দিরের দক্ষিণ দিকের প্রবেশদ্বার ছাড়া আর কোন প্রবেশপথ নেই। পুব দিকের দেওয়ালে পোড়ামাটির ফলকে প্রতিষ্ঠালিপি উৎকীর্ণ ছিল। সংস্কারের সময় সেটি ভগ্ন, স্থানচ্যুত এবং পরে নাকি বিনষ্ট হয়। পাদ-পীঠের উপর প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ, যথাক্রমে, ১৭ ফুট ৯ ইঞ্চি (৫·৪ মি.) ও ১১ ফুট ৫ ইঞ্চি (৩·৫ মি.) এবং উচ্চতা প্রায় ২৫ ফুট (৭·৬ মি.)। মন্দিরের শিরোদেশে আমলক, কলস ত্রিশূল ও চক্রবিশিষ্ট তিনটি চূড়া আছে। এ মন্দিরের 'টেরাকোটা'-সজ্জার-বিশেষত্ব বর্মধারী, সশস্ত্র মোগলমূর্তির আধিক্য। সামনের দেওয়ালে, বামে ও ডাইনে, ছোট ছোট কুলঙ্গিতে, যথাক্রমে, ৭টি ও ৬টি এহেন মোগল-মূর্তি উৎকীর্ণ। নদীয়া জেলার অন্য কোন মন্দিরে এত অধিকসংখ্যক মোগলসৈন্যের প্রতিকৃতি দেখা যায় না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এ দেবালয় প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে, ১০৮৭ হিজরীতে (১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে), নদীয়ারাজ রুদ্র রায় মোগল সম্রাট আলমগীরের কাছ থেকে গয়েশপুর, হোসেনপুর, খাড়ি, জুড়ি প্রভৃতি বিস্তীর্ণ পরগণার ভূস্বামীত্বের ফরমান লাভ করেন। মন্দিরের খিলান ফুলকাটা বা পত্রাকৃতি। প্রবেশদ্বারের দু পাশে দুটি ছোট থাম। খিলানের উপর ফুলকারি নকশা এবং ১২টি প্রতীক আটচালা-শিবমন্দির এবং তার উপরে আরও ফুলকারি নকশা এবং জ্যামিতিক অলংকরণ আছে। বাঁ দিকের পাদপীঠসংলগ্ন সারিতে গজ ও অশ্বারোহীদের যুদ্ধদৃশ্য, বস্ত্রহরণ, নৌকাবিলাস প্রভৃতি আর ডান দিকে মিথুনমূর্তি, কৃষ্ণলীলা, ইউরোপীয়ের ব্যাঘ্র শিকার, হরিণ শিকার, হরিণের প্রাণভয়ে পলায়ন, সজ্জিত হাতি

ইত্যাদির ভাস্কর্য নিবদ্ধ। একটি সুন্দর হংসপঙ্ক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ দিক ছাড়া অন্য দিকে অলংকরণ নেই। বিভিন্ন সময়ে সংস্কৃত এ দেবালয়ের পশ্চিমে নাটমন্দির ও ভোগশালার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

শোনা যায়, ভবানন্দ মজুমদার এখানে অন্নপূর্ণা দেবীর আর একটি মন্দিরও নির্মাণ করেছিলেন এবং তাঁর প্রসাদেই তিনি নাকি নদীয়ারাজ হন। কিন্তু এখন সে মন্দিরের কোন চিহ্ন নেই।

এখানে হজরত সাউ মুল্‌কে গোজ বা 'বুড়ো সাহেবে'র একটি দরগা আছে। নদীয়া জেলায় মুসলমানদের দরগাগুলির মধ্যে এটিই প্রাচীনতম। এখানে হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে সকলেই মানত করেন। দরগাটির আর একটি প্রচলিত নাম—মল্লিক গস্‌-এর দরগা। 'মল্লিক গস্' উপাধিবিশেষ; 'মলি-অল-গস্' শব্দ থেকে রূপান্তর হয়েছে ব'লে অনুমিত হয়। 'মলি-অল' অর্থে বাদশা এবং 'গস্' অর্থে ফকির বোঝায়। দুয়ে মিলে ফকিরের বাদশা। কথিত আছে যে, ভবানন্দ মজুমদারের রাজধানী স্থাপনাকালে হজরত সাউ মুল্‌কে গোজ নামে এক সিদ্ধপীর ও তাঁর ভাই করিম দু জন শিষ্যসহ এখানে আসেন। করিমও পরে সিদ্ধপীর হন। মৃত্যু হলে, তাঁদের এই দরগায় কবর দেওয়া হয়। দরগাটি পশ্চিমমুখী। থামগুলি পাথরের। খিলান পত্রাকৃতি। ভিতরে পীরের সমাধি। সমাধির শিরোভাগে অস্পষ্ট অক্ষরে এক লিপি ক্ষোদিত আছে। পাশেই করিমের সমাধি। দরগাটি এখন বিধ্বস্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ। শোনা যায়, আদিতে এটি নাকি আগাগোড়া প্রস্তরনির্মিত ছিল। দরগার সন্নিকটে যে অলংকৃত পাথরের থামটি দেখা যায়, সাধারণ্যে তার নাম 'আশাবারি' (জাদুদণ্ড) এবং কেউ সেটিকে স্পর্শ করে না। এসব অলংকৃত প্রস্তর খুব সম্ভব পূর্বতন হিন্দু-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। প্রতিবৎসর অম্বুবাচী তিথিতে পীরের মৃত্যুদিবস উপলক্ষে এই সমাধিকে ঘিরে মেলা বসে। এখানে একটি প্রাচীন মসজিদও আছে।

মাণিকডিহি : কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত ও শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথের দেবগ্রাম স্টেশন থেকে (বা ৩৪ নং জাতীয় সড়কসংলগ্ন দেবগ্রাম থেকে) পিচের রাস্তায় ৬ মাইল ও কাঁচা পথে ২ মাইল, মোট ৮ মাইল (১২.৯ কি. মি.) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত প্রাচীন গ্রাম ও বৈষ্ণব শ্রীপাট। ভাগীরথী এবং দ্বারকা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এ পল্লী প্রায় তিন দিকেই ভাগীরথীবেষ্টিত। মহাপ্রভু, অদ্বৈতাচার্য ও

ঈশ্বর পুরীর গুরু ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরী। মাধবেন্দ্রের পুত্র বিষ্ণুদাস আচার্য। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীমূলক বৈষ্ণবগ্রন্থসমূহে বিষ্ণুদাসের উল্লেখ আছে। তিনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং অদ্বৈতগৃহিনী সীতাদেবীর চরিতকথা 'সিতাগুণকদম্ব' পুঁথির রচয়িতা। রচনাকাল আনুমানিক ১৪৫৬ শক বা ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দ। বিষ্ণুদাস কখনও এ গ্রামে এসেছেন কিনা জানা যায় না। তবে তাঁর পুত্র জয়কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে যাবার পথে স্বপ্নাদেশে এখানে বসতি স্থাপন করেন ব'লে শোনা যায়। তিনিই এখানে দারুনির্মিত রাধাবল্লভ ও রাধারাণীর যুগলসেবা প্রচলিত করেন। সে বিগ্রহ দুটি আজও বর্তমান। এখানকার গোস্বামীরা আচার্য মাধবেন্দ্র পুরীর বংশধর। এই বংশে বহু সিদ্ধপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। বৈষ্ণব সাধু বামনদাস বাবাজী এখানে গোপীনাথ, গোপিণী, রাধাদামোদর, লক্ষ্মীজনার্দন, লক্ষ্মীনারায়ণ, দধিমাধব, অনন্তদেব, শ্রীধর, নৃসিংহদেব ও পদ্মনাভশিলা প্রভৃতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলি এখন গোস্বামীদের গৃহে নিত্যপূজিত।

কেদার মাহাতো নামে জনৈক ব্যক্তি এখানে নাকি একটি শিবমন্দির ও মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। ভূমিকম্পে সেগুলি ধ্বংস হয়েছে। পরে নতুন দুটি দালান-মন্দির নির্মিত হয়। এখানে বৈষ্ণব মহন্তদের কয়েকটি আখড়া এবং দিনাজপুরের কোনও এক বৈষ্ণব রাজার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। গ্রামের ষষ্ঠীতলায় পাথরের এক বড় বিষ্ণুমূর্তির ভগ্ন ঊর্ধ্বাংশ রক্ষিত আছে। এটির পূর্ব-ইতিহাস জানা যায় না। স্থানীয় গোস্বামীবংশের প্রপৌত্রী লক্ষ্মীদেবী ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাতীরে সহমৃতা হবার পর থেকে তাঁর পরিত্যক্ত শাড়ি 'সতীর শাড়ি' নামে এখানে মহা সমাদরে রক্ষিত।

নিকটবর্তী কালীগঞ্জ গ্রামে অর্ধবৃত্তাকারে স্থাপিত তিনটি পরিত্যক্ত চারচালা-শিবমন্দির আছে। সেগুলির দেওয়ালে পোড়ামাটির যৎসামান্য অলংকরণ দেখা যায়।

মায়াপুর: নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত এবং গঙ্গা ও জলঙ্গী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। নবদ্বীপ থেকে নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে বা মহেশগঞ্জ থেকে অনুরূপভাবে জলঙ্গী পার হয়ে সেখানে যাওয়া যায়। কৃষ্ণনগর থেকে ৩৪নং জাতীয় সড়ক বরাবর জলঙ্গীর সাঁকো অতিক্রম ক'রে, বাঁ-হাতি পিচের রাস্তায়ও যাওয়া যায়। এ পথে নিয়মিত বাস চলে।

অনেকের মতে, মায়াপুরই প্রাচীন নবদ্বীপ এবং এখানেই শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। বর্তমানে মায়াপুর গঙ্গার পূর্ব

তীরে অবস্থিত। বৈষ্ণবগ্রন্থাদিতেও উল্লেখ আছে যে, নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্বতটে অবস্থিত। নরহরি চক্রবর্তীর (বৈষ্ণব নাম 'ঘনশ্যাম দাস') 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে নবদ্বীপমধ্যবর্তী মায়াপুরই শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান ব'লে উল্লিখিত হয়েছে।

"নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর ॥"

ভগবানের আবির্ভাবস্থানকে বলা হয় যোগপীঠ। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কাশীর দণ্ডীসমাজনেতা প্রকাশানন্দ সরস্বতীর (শ্রীচৈতন্য-প্রদত্ত তাঁর নতুন নাম—প্রবোধানন্দ সরস্বতী) 'নবদ্বীপশতক' এবং জগদানন্দ গোস্বামীকৃত 'প্রেম বিবর্ত্ত' গ্রন্থেও মায়াপুরকে শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থানরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। গঙ্গার গতি পরিবর্তনের ফলে এই এলাকার বারবার ভৌগোলিক হেরফের হয়েছে। এ কারণে, মায়াপুর ও নবদ্বীপের প্রকৃত অবস্থান নিয়ে এখনও মতবিরোধের অবসান হয়নি।

পরমবৈষ্ণব জগন্নাথদাস বাবাজী, ভক্তগণসহ সংকীর্তনরত গৌরনিতাই প্রভৃতি বহু বিগ্রহ এখানে নিত্যউপাসিত। শ্রীঅদ্বৈত ভবনে আছে মহাপ্রভু ও তাঁর সেবারত অদ্বৈতপ্রভুর মূর্তি। শ্রীগদাধর অঙ্গনে আছে শ্রীগৌর-গদাধর বিগ্রহ। শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠাতার সমাধির উপর দেউল শ্রেণীর সুন্দর মন্দিরটি ২৯টি চূড়া ('অঙ্গশিখর') যুক্ত ও শিল্পনৈপুণ্যমণ্ডিত। মধ্যস্থলের চূড়াটি গোলাকৃতি এবং তার শীর্ষে বিষ্ণুধ্বজ স্থাপিত। এখানে মহাপ্রভু ও রাধাকৃষ্ণের মূর্তি আছে। মন্দিরের চার দিকের চারটি কক্ষে ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক ও শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য মধ্বাচার্য, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক ও রামানুজের প্রস্তরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। মুরারী গুপ্তের ভবনে রামসীতার বিগ্রহ নিত্যপূজিত। এখানে বৈষ্ণব গবেষণাগার ও পরাবিদ্যাপীঠও আছে।

প্রতিবৎসর ফাল্গুনী দোলপূর্ণিমায়, মহাপ্রভুর আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে, নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ সংকীর্তনশোভাযাত্রা সহকারে পরিক্রমা করা হয় এবং মহোৎসবাদি হয়ে থাকে। তা ছাড়া মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠাতার আবির্ভাব উদ্‌যাপন বা শ্রীব্যাসপূজা বিশেষভাবে উল্লেখ্য উৎসব।

এখানকার যোগপীঠ মন্দিরের উত্তরে ইতিহাসখ্যাত বল্লালদীঘি। একদা এই দীঘির পাড়ে নাকি একটি ধ্বংসস্তূপ ছিল। বাংলার শেষ

হিন্দু-নৃপতি লক্ষ্মণসেনের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ব'লে এই ধ্বংসস্তূপটি পরিচিত। সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর (কেদারনাথ দত্ত) মায়াপুর-আবিষ্কারক রূপে পরিচিত। প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠ এবং অন্যান্য স্থানে শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা।

এখানকার সুউচ্চ ও সুন্দর যোগপীঠ মন্দিরটি ৪৪৮ গৌরাব্দে (১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মিত। এত উঁচু মন্দির বাংলায় আর আছে কিনা সন্দেহ। সাধারণভাবে, মন্দিরটি নবচূড়; কিন্তু মাঝখানের চূড়ার গায়ে, প্রতি দিকে চারটি ক'রে, মোট ষোলটি অঙ্গশিখর আছে। এ দেবালয়ে উপাসিত বিগ্রহ শ্রীগৌর-রাধামাধব, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-লক্ষ্মীপ্রিয়া এবং পঞ্চপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, গদাধর পণ্ডিত ও শ্রীবাস আচার্য। এ মন্দিরের ভিত্তি খননকালে শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী কষ্টিপাথরের একটি ক্ষুদ্র, সুন্দর বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া যায়। 'সিদ্ধার্থসংহিতা'র মতে, বিগ্রহটি চব্বিশ প্রকার বিষ্ণুমূর্তির অন্যতম 'অধোক্ষজ' এবং সেটি নাকি ছিল শ্রীচৈতন্যের পিতৃদেব জগন্নাথ মিশ্রের গৃহদেবতা। যোগপীঠ মন্দিরে মূর্তিটি এখন রক্ষিত আছে।

যোগপীঠ মন্দিরস্থলেই মহাপ্রভু নাকি আবির্ভূত হন। সেজন্য পাশের নিম গাছের নীচে শচীমাতার সূতিকামন্দিরে মাতৃক্রোড়ে শিশু-নিমাই, শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্রের মূর্তি রক্ষিত। এখানে নৃসিংহদেবের মন্দির এবং ক্ষেত্রপাল নামক শিবের এক দেউল-মন্দিরও দেখা যায়।

যোগপীঠ মন্দিরের উত্তরে খোলভাঙার ডাঙা বা শ্রীবাসঅঙ্গন অবস্থিত। এখানেই নাকি চাঁদ কাজী মহাপ্রভুর সংকীর্তনদলের মৃদঙ্গ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। অদূরের বল্লালদীঘি শুষ্কভূমিতে পরিণত হয়েছে এবং এখন সেখানে চাষবাস হয়। বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাস তাঁর কড়চায় উল্লেখ করেছেন যে, ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভু এবং তাঁদের ভক্তবৃন্দ বল্লালদীঘিতে স্নান করতেন ঃ

"প্রকাণ্ড এক দীঘি হয় তাহার নিয়ড়।
কেহ কেহ বলে যারে বল্লাল সায়র ॥
বল্লাল রাজার বাড়ী তাহার নিকটে।
ভাঙ্গাচুরা প্রমাণ আছয়ে তার বটে ॥"

মুড়াগাছা ঃ নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত ও শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথের মুড়াগাছা স্টেশন থেকে ১ মাইল (১·৬ কি.মি.) পশ্চিমে অবস্থিত।

আদি রাঘবপুর গ্রামে একদা অগ্নিকাণ্ডে গাছপালা ন্যাড়া (স্থানীয় কথ্যভাষায় 'মুড়ো') হয়ে গেলে, নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পার্শ্ববর্তী গুড়গুড়ি নদীপথে যাবার সময় নাকি নতুন নামকরণ করেন—মুড়োগাছা বা মুড়াগাছা। এ পল্লীর আদি বাসিন্দা তহশীলদার রাঘবরাম দেববিশ্বাস এখানে ব্রাহ্মণদের এনে বসতি করান। অতঃপর হিজলীর নিমক-মহলের দেওয়ান কাশীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর বংশের দেবীদাস মুখোপাধ্যায় এখানে মন্দির-বিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠা করেন।

স্থানীয় বাজারে সর্বমঙ্গলার তিনটি আটচালা-মন্দির সংযুক্তভাবে নির্মিত। পশ্চিমমুখী এ দেবালয়গুলির সামনে অলিন্দ আছে। দেবী মৃণ্ময়ী, দ্বিভুজা এবং চণ্ডীধ্যানে নিত্যপূজিতা। প্রতি মন্দিরে একটি ক'রে শিবলিঙ্গও আছে। সামনের দেওয়ালগুলিতে কিছু পঙ্খের অলংকরণ দেখা যায়। মন্দিরগুলি দেবীদাস মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১১৯৭ বঙ্গাব্দে (১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত। কাছেই, এক বটগাছের নীচে, বাঁধানো বেদীতে পাথরের প্রাচীন সর্বমঙ্গলামূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত। বৈশাখীসংক্রান্তি তিথিতে সর্বমঙ্গলার বার্ষিক অভিষেক উপলক্ষে এখানে বিশেষ পূজা হয় ও মেলা বসে। সর্বশ্রেণীর হিন্দুরা তাতে যোগ দেন।

কাশীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক নির্মিত দ্বাদশকোণ ভিত্তিবেদীর উপরে দ্বাদশকোণ রাসমঞ্চটি এখানকার অন্যতম দ্রষ্টব্য পুরাকীর্তি। সেখানে কাশীপ্রসাদ-প্রতিষ্ঠিত পাথরের বংশীধারী কৃষ্ণ ও পিতলের রাধা-রাণীর রাস উৎসব হয়ে থাকে। কাশীপ্রসাদ, পল্লীর অন্যত্র সর্বমঙ্গলা মন্দিরের অনুরূপ কিন্তু আকারে ছোট, তিনটি চারচালা-মন্দির সংযুক্তভাবে নির্মাণ করেন। পশ্চিমমুখী এ দেবালয়গুলির সামনে ঢাকা দালান আছে। বিগ্রহ—গোপীকান্ত, রাধারাণী, অষ্টধাতুর অন্নপূর্ণা ও শ্বেত-পাথরের শিবলিঙ্গ। অদূরে, এক দালান-মন্দিরে, চার আকারের চারটি শিবলিঙ্গ উপাসিত। আর একটি দালান-মন্দিরেও দুটি শিবলিঙ্গ আছে। কাশীপ্রসাদের পিতলের সুবৃহৎ রথটি এখন আর নেই। তাঁর বৃহৎ বসতবাটি ও মুখোপাধ্যায়বংশীয়দের কয়েকটি জীর্ণ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পরিত্যক্ত অবস্থায় এখনও দেখা যায়।

এখানে আর একটি পশ্চিমমুখী চারচালা-শিবমন্দিরে শ্বেতপাথরের এক শিবলিঙ্গ আছে। সেটির সামনের দেওয়ালে নাকি একদা পোড়ামাটির অলংকরণ ছিল। প্রতিষ্ঠাফলকহীন এ দেবালয়টি মুখোপাধ্যায়বংশেরই কেউ স্থাপন করেছিলেন ব'লে শোনা যায়।

মুরুটিয়া ঃ করিমপুর থানার অন্তর্গত। কৃষ্ণনগর-করিমপুর সড়কসংলগ্ন মহিষবাথান গ্রাম থেকে ৩ মাইল (৪·৮ কি.মি.) দীর্ঘ পিচের এক শাখাপথে সেখানে যাওয়া যায়।

এখানে, ভৈরব নদের পূর্ব তীরে, দক্ষিণমুখী, জগন্নাথ মন্দিরটি অবস্থিত। শোনা যায়, আগে নাকি এটি একচূড়-মন্দির ছিল। এখন চূড়াহীন এক দালান-মন্দিরে জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের কাঠের মূর্তি উপাসিত। 'মেহেরপুর-কোলা'র (বাংলাদেশ) মুখোপাধ্যায়বংশীয় জমিদারেরা এই মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। স্নানযাত্রার সময় এখানে উৎসব ও মেলা হয়।

নিকটবর্তী খানপুর গ্রামে, জঙ্গলের মধ্যে, পরিত্যক্ত এক চারচালা জোড়া-শিবমন্দির দেখা যায়। উত্তরমুখী, জীর্ণ মন্দির দুটির একটির প্রবেশদ্বারের উপরের পোড়ামাটির প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়, শম্ভুনাথ মৈত্র ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এগুলি নির্মাণ করেন।

মৃগী ঃ তেহট্ট থানার অন্তর্গত ও কৃষ্ণনগর-করিমপুর বাসপথসংলগ্ন ডাঙ্গাপাড়া গ্রাম থেকে কাঁচা রাস্তায় ৩ মাইল (৪·৮ কি.মি.) উত্তরে অবস্থিত।

এখানে একটি উত্তরমুখী চারচালা-শিবমন্দিরে এক শিবলিঙ্গ নিত্যউপাসিত। সামনের দেওয়ালে সামান্য 'টেরাকোটা'-অলংকরণ আছে। প্রবেশদ্বারের উপরে নিবদ্ধ পাথরের উৎসর্গলিপি থেকে জানা যায়, ১৬৮৯ শকে অর্থাৎ ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। সে লিপিতে প্রতিষ্ঠাতার কোন উল্লেখ না থাকলেও, জনশ্রুতি দেবালয়টি নাকি রাণী ভবানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। পাশেই ভগ্ন ভোগ-দালান। আবেষ্টনপ্রাচীর ও প্রবেশতোরণের ধ্বংসাবশেষও দেখা যায়।

পূর্বে এ পল্লীতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বসতি ছিল। এখন তাঁদের বংশধরদের কয়েকঘর মাত্র বাস করেন।

যশোড়া ঃ চাকদহ থানার অন্তর্গত এবং শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথের চাকদহ স্টেশন থেকে ২ মাইল (৩·২ কি. মি.) পশ্চিমে পিচের সড়কের পাশে অবস্থিত। রেল-স্টেশন থেকে সাইকেল-রিক্‌শয় যাওয়া যায়।

এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্যতম পারিষদ তথা দ্বাদশসখার অন্যতম জগদীশ পণ্ডিতের পাটবাড়ি, তাঁর প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথবিগ্রহের মন্দির এবং দোলমঞ্চ আছে। শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এখানে এসেছিলেন। কথিত আছে, জগদীশ পণ্ডিত পুরীধাম থেকে জগন্নাথ-

দেবের নবকলেবরধারণকালে পরিত্যক্ত বিগ্রহটি স্বয়ং যষ্টিতে বহন ক'রে পদব্রজে এখানে এনে প্রতিষ্ঠা করেন। জগন্নাথদেব পাঁচ খিলানবিশিষ্ট এক দালান-মন্দিরে নিত্যউপাসিত। শোনা যায়, নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরটি নির্মাণ করিয়ে দেন। বহুবার সংস্কৃত এ দেবালয়ে পূজিত সুভদ্রা ও বলরামবিহীন জগন্নাথের কাঠের বিগ্রহটির উচ্চতা ৪ ফুট (১·২ মি·)। এ মন্দিরে জগদীশপত্নী 'দুঃখিনী মাতা'র পূজিত দারুময় গৌরগোপাল এবং পিতল ও মাটির কয়েকটি রাধাকৃষ্ণমূর্তিও বিভিন্ন নামে রক্ষিত আছে। সংকীর্তন-পথপরিক্রমার ছাড়পত্রস্বরূপ দুটি পিতলের খন্তি ও পুরীধাম থেকে সংগৃহীত জগন্নাথবিগ্রহটি বহন ক'রে আনবার সময় জগদীশ পণ্ডিতের ব্যবহৃত লাঠিটিও দ্রষ্টব্য বস্তুর অন্যতম।

যশোড়া বৈষ্ণবতীর্থ ও শ্রীপাট। এখানে পৌষ মাসের শুক্লা-দ্বাদশী তিথিতে জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব মহোৎসব ও স্নানযাত্রার সময় জগন্নাথদেবের উৎসব পালিত হয়। উঁচু পাদপীঠের উপর প্রতিষ্ঠিত, এখানকার জগন্নাথদেবের অষ্টকোণ, একচূড়-দোলমঞ্চটি প্রাচীন। সেটির গায়ে কিছু পঙ্কের অলংকরণ দেখা যায়। স্থানীয় একটি দালান-মন্দিরে 'বুড়ো-মা' নামে পরিচিতা এক মৃন্ময়ী কালী প্রতিষ্ঠিতা। জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় তাঁর বিশেষ পূজা হয়। এখানে একটি প্রাচীন বৃহৎ শিবলিঙ্গের ভগ্নাবশেষ আছে। আর একটি দালান-মন্দিরে জোড়া শিবলিঙ্গ ও পাথরের এক কালীমূর্তির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

রাণাঘাট ঃ রাণাঘাট থানার অন্তর্গত এবং রাণাঘাট জংশন রেল-স্টেশনসংলগ্ন মহকুমা শহর।

'রণা' ডাকাতের ঘাঁটি, 'রণাঘাঁটি', থেকে রাণাঘাট নামের উৎপত্তি হয়ে থাকতে পারে। আবার, নদীয়ারাজমহিষীর ঘাট, 'রাণীর ঘাট', থেকে রাণাঘাট হয়েছে ব'লেও শোনা যায়। বহুকাল পূর্বে রণা ডাকাত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধেশ্বরী কালীমূর্তি এখানে এক দালান-মন্দিরে আজও উপাসিতা। রাণা মানসিংহ যশোহর অভিযানকালে নাকি এখানে চূর্নী-তীরে অবতরণ করেছিলেন। রাণার অবতরণের ঘাট থেকে রাণাঘাট নাম হওয়াও সম্ভব। স্থানীয় পালচৌধুরী উপাধিধারী জমিদারদের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণপান্তি (১৭৪৯—১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ) অতি সাধারণ অবস্থা থেকে স্বীয় অধ্যবসায় ও ক্ষমতায় প্রভূত ভূসম্পত্তির অধিকারী হন। 'পালচৌধুরী' নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি। পালচৌধুরীদের প্রাচীন সুবৃহৎ ভদ্রাসন রাণাঘাটে আজও বিদ্যমান।

পালচৌধুরীবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে, একই ভিত্তিবেদীর উপর, এক-জোড়া দক্ষিণমুখী আটচালা-শিবমন্দির আছে। তাদের সামনে অলিন্দ নেই। একটি ক'রে প্রবেশপথের খিলান পত্রাকৃতি অর্থাৎ খিলানের নীচের প্রান্ত ছোট ছোট অর্ধবৃত্তাকারে ঢেউখেলানো। মন্দির দুটির শুধু সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ পোড়ামাটির অলংকরণের মধ্যে নকাশি কারুকার্য থেকে মূর্তিই বেশী। প্রথম মন্দিরটিতে, পাদপীঠসংলগ্ন সারিতে হংসপঙ্‌ক্তি, ফুলকারি নকশা, দশভুজা ও কালীমূর্তি আছে। দু পাশের দেওয়ালে কুড়িটি কুলঙ্গিতে পোড়ামাটির দেবদেবীমূর্তি উৎকীর্ণ। প্রবেশদ্বারের খিলানের নীচের প্রান্ত বরাবর ন'টি প্রতীক-শিবমন্দির, দুটি বড় পদ্মফুল ও নকাশি লতা আছে। তার উপরে, চোদ্দটি কুলঙ্গিতে, আরও দেবদেবীর মূর্তি। দ্বিতীয় মন্দিরটিতে 'টেরাকোটা'-সজ্জার বিন্যাস প্রথমটিরই মত। তবে সেটিতে মূর্তির সংখ্যা বেশী। দু পাশের দেওয়ালে, ছোট ছোট কুলঙ্গিতে, চব্বিশটি ক'রে মোট আটচল্লিশটি দেবদেবীমূর্তি আছে। প্রবেশপথের উপরে বাঁকানো দু সারি ছোট ছোট কুলঙ্গিতে আরও আটত্রিশটি দেবদেবী বা সামাজিক দৃশ্যের ভাস্কর্য দেখা যায়। বর্তমানে জীর্ণ হলেও, সাবেক কারিগরি উচ্চ শ্রেণীর ছিল ব'লে মনে হয় না। সংস্কারের নামে বারংবার চুনকাম করার দরুন (যার ফল 'টেরাকোটা'-অলংকরণের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর), মূর্তিগুলি এখন আর ভালভাবে বোঝা যায় না। কয়েকটি মূর্তি ভেঙেও গিয়েছে। দুটি মন্দিরেই কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ নিত্যপূজিত। কোনটিতেই প্রতিষ্ঠাফলক নেই। কৃষ্ণপান্তির অনুজ শম্ভুচন্দ্র আনুমানিক ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে মন্দির দুটি প্রতিষ্ঠা করেন ব'লে পালচৌধুরীবংশীয়েরা অনুমান করেন। কৃষ্ণপান্তির বিরাট বসতবাটির অর্ধাংশ চূর্ণীগর্ভে বিলীন হলেও, দুটি আটকোণা নওবতখানা আজও ভগ্নদশায় টিকে আছে। শম্ভুচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত নাচঘর, সিংহদ্বার এবং অট্টালিকাদি বর্তমানে ভগ্ন ও পরিত্যক্ত। তাঁর চিত্রিত ও সুদৃশ্য পালকিটি জীর্ণ অবস্থায় এখনও রক্ষিত আছে। একদা শম্ভুচন্দ্রের বজরায় স্থাপিত ৪½ ইঞ্চি (১১½ সে. মি.) মুখবিশিষ্ট এবং ৩৬ ইঞ্চি (৯৩ সে. মি.) দীর্ঘ দুটি লোহার কামান পালচৌধুরীবাড়িতে রক্ষিত অন্যান্য পুরাবস্তুর অন্যতম।

পালচৌধুরীদের গোপীনাথের মন্দির চূর্ণীগর্ভে বিলীন হবার পর, নতুন দালান-মন্দিরটি আনুমানিক ১০০ বছর পূর্বে নির্মিত হয়। এই মন্দিরে তিনটি স্বতন্ত্র সিংহাসনে কাঠের জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা, কষ্টিপাথরের বংশীধারী গোপীনাথ, অষ্টধাতুর রাধিকা, পাথরের গোপাল,

পিতলের শ্রীধর এবং পাথরের রাধাগোবিন্দ ও রাধিকা বিগ্রহ আছে। এখানে ছোট একটি কাঠের রথও দেখা যায়। পালচৌধুরীবাড়ির অদূরে, বর্গাকার দালানের উপর, নবচূড় নিস্তারিণী মন্দিরে নিস্তারিণী কালী নিত্যপূজিতা। এ মন্দিরের দেওয়ালে কিছু পঙ্খের কাজ আছে।

ষষ্ঠীতলায়, ব্রজবল্লভের মন্দিরের পাশে, অনুরূপ বর্গাকার দালানের উপর নবচূড়াযুক্ত মন্দিরে এক বাদামী রঙের প্রাচীন শিবলিঙ্গ উপাসিত। গৌরীপট্টটি কষ্টিপাথরের। ব্রজবল্লভের দালান-মন্দিরটি আয়তাকার। সেখানে কষ্টিপাথরের বেনুকৃষ্ণ এবং অষ্টধাতুর রাধিকা বিগ্রহ আছে। তা ছাড়া, এখানকার বড়বাজারে এক দালান-মন্দিরে মদনমোহন ও ছোটবাজারে আর এক দালান-মন্দিরে রাধাবল্লভ বিগ্রহ দুটি প্রাচীন ব'লে প্রকাশ।

রুকুনপুর ঃ কোতোয়ালী (কৃষ্ণনগর) থানার অন্তর্গত এবং শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথের মুড়াগাছা ষ্টেশন থেকে প্রায় ৩½ মাইল (৫·৬ কি.মি.) পশ্চিমে কাঁচা সড়কপথে অবস্থিত।

শোনা যায়, কৃষ্ণদাস মহন্ত নামে এক সিদ্ধপুরুষ এখানে গঙ্গাতীরে বসুলক্ষ্মীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সে মন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে। বর্তমানে বটকৃষ্ণ মহন্তের বসতবাটিতে কাঠের তৈরী শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, বীরভদ্র, রামচন্দ্র, বসু (নিত্যানন্দের স্ত্রী) এবং লক্ষ্মী (মহাপ্রভুর স্ত্রী) প্রভৃতির বিগ্রহ নিত্যউপাসিত। অন্যান্য উল্লেখ্য পুরাবস্তু ও বিগ্রহ—পাথরের একটি সুন্দর বিষ্ণুপট্ট, অষ্টধাতুর ক্ষুদ্রাকার এক অপরূপ বিষ্ণুমূর্তি, রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি এবং পিতলের বহু দেবদেবীমূর্তি। এদের মধ্যে কয়েকটি বেশ প্রাচীন ব'লে অনুমিত। তা ছাড়া, এখানে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও দ্বাদশ-গোপালের বিগ্রহ এবং শিবলিঙ্গও আছে। সে সব বিগ্রহের উৎসবাদিও হয়ে থাকে।

গঙ্গাতীরে 'অন্তিম আশ্রম' নামে এক দালানবাড়ি এবং পাশেই এক প্রাচীন তুলসীমঞ্চ দেখা যায়। আগে অন্তর্জলি বা সতীদাহের জন্য অনেককে এখানে আনা হত।

শান্তিপুর ঃ শান্তিপুর থানার অন্তর্গত পৌরশহর। কৃষ্ণনগর থেকে বাসপথে ও ছোট রেলপথে এবং রাণাঘাট থেকে বাসপথে ও বড় রেলপথে সেখানে যাওয়া যায়। ৩৪নং জাতীয় সড়ক শহরের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে।

শান্তিপুর প্রাচীন স্থান। বহু গ্রন্থে শান্তিপুরের প্রাচীনত্বের উল্লেখ আছে। গঙ্গা একদা এ জনপদের তিন দিক দিয়ে প্রবাহিত ছিল ;

এখন দূরে, পশ্চিম দিকে, সরে গেছে। হরিচরণ দাস রচিত 'অদ্বৈতমঙ্গলে' আছে ঃ

"শান্তিপুর গ্রাম হয় যোজন প্রমাণ।
প্রভু কহে নিত্যধাম মথুরা সমান॥
বৈকুণ্ঠে বিরজা নদী বহে চতুর্দ্দিগে।
শান্তিপুরে দ্রবময়ী বহে তিনভাগে॥"

শান্তিপুর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনটি মত প্রচলিত। জনৈক শান্তমুনির বাসস্থান ছিল ব'লে শান্তপুর, তা থেকে শান্তিপুর ; এখানে শান্তিপ্রিয় মানুষের বাস ছিল ব'লে শান্তিপুর ; এখানে গঙ্গাতীরে মুমূর্ষুদের সজ্ঞানে নিয়ে আসা হত এবং দৈবাৎ কেউ রোগমুক্ত হলে আর সংসারে ফিরে না গিয়ে এখানেই শান্তিতে বাস করবার কারণে শান্তিপুর।

শান্তিপুর প্রখ্যাত বৈষ্ণবতীর্থ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্যতম পারিষদ শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের প্রপিতামহ নরসিংহ মিশ্র ১২৯১ শকে অর্থাৎ ১৩৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এখানে এসে বসতি করেন। অদ্বৈত (জন্ম ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দ) এখানে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ক'রে 'অদ্বৈত আচার্য' উপাধি লাভ করেন এবং এখানেই স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। বৈষ্ণবদের কাছে তিনি মহাবিষ্ণু বা শিবের অবতাররূপে উপাসিত। "অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার" ('শ্রীচৈতন্যভাগবত')। অদ্বৈতের বয়স যখন ৫২ বছর তখন শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হন। তিনি বহুবার অদ্বৈতগৃহে পদার্পণ করেছিলেন। অদ্বৈতাচার্য ১২৫ বৎসর বয়সে শান্তিপুরে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বংশধরেরা এখনও এখানকার অধিবাসী।

কথিত আছে, বখ্‌তিয়ার খিলজী শান্তিপুর অতিক্রম ক'রে নবদ্বীপে যান। 'বক্তারঘাট' ও 'ঘোড়ালিয়া' নামে স্থানীয় দুটি অঞ্চল তাঁর স্মৃতিবিজড়িত হওয়াই সম্ভব।

প্রাচীন বৈষ্ণবকেন্দ্র হওয়ার দরুন শান্তিপুর পুরাকীর্তিসমৃদ্ধ স্থান। এখানকার মতিগঞ্জ-বেজপাড়ায় জলেশ্বর মন্দিরটি অবস্থিত। পাদপীঠের উপর স্থাপিত দক্ষিণমুখী, অলিন্দবিহীন চারচালা-মন্দির। পুব দিকেও আর একটি প্রবেশদ্বার আছে। দুটি দরজারই খিলানের উপর প্রান্তে প্রতীক শিবমন্দিরের সারি উৎকীর্ণ। আয়তন, পুব-পশ্চিম বরাবর ২১ ফুট ১০ ইঞ্চি (৬·৭ মি.), উত্তর-দক্ষিণে ২৪ ফুট ১০ ইঞ্চি (৭·৬ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ৪৫ ফুট (১৩.৭ মি.)। দক্ষিণ দিকের নতুন নাটমন্দিরটি যেখানে মন্দিরের দেওয়াল সংলগ্ন ক'রে পুরাকীর্তিটির খুবই ক্ষতিসাধন করা হয়েছে, সেখানে হয়ত কোন প্রতিষ্ঠালিপি ছিল, কিন্তু এখন কিছুই

দেখা যায় না। নদীয়ারাজ রুদ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণের জননী আঠারো শতকের প্রথম দিকে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন ব'লে শোনা যায়। এক সময়ে শিবলিঙ্গের নাম ছিল রুদ্রকান্ত; মতান্তরে, রাঘবেশ্বর। মন্দিরটি নদীয়ারাজ রাঘব রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকতেও পারে। একদা এখানে দারুণ অনাবৃষ্টির সময়, সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বৃষ্টির জন্য শিবের মাথায় প্রচুর পরিমাণে গঙ্গাজল ঢেলেছিলেন। তারপরই বেশ বৃষ্টি হয়। তখন থেকেই, অর্থাৎ গত শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে, শিবের নাম হয় 'জলেশ্বর'। শিবলিঙ্গটি কালো পাথরের ও উচ্চতায় প্রায় ৩ ফুট (৯২ সে. মি.)। গর্ভগৃহের একটি কুলঙ্গিতে অভয়াতারিণী দুর্গার পিতলের দ্বিভুজা এবং ত্রিনয়নী মূর্তি রক্ষিত আছে। তিনি ধ্যানাসীনা, দক্ষিণ হস্তে বরাভয়মুদ্রা।

মন্দিরটি পোড়ামাটির মূর্তি ও সূক্ষ্ম নকাশি অলংকরণযুক্ত। মন্দিরের দক্ষিণ ও পুব দিকের প্রবেশদ্বার দুটিকে ঘিরে দু সারি কুলঙ্গির মধ্যে মূর্তিগুলি উৎকীর্ণ; দেওয়ালের বাকী অংশ প্রধানতঃ নকাশি সজ্জায় আবৃত। মূর্তিগুলির বিষয়বস্তু পৌরাণিক ও সামাজিক—যথা, কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য, ভীষ্মের শরশয্যা, রামায়ণের কাহিনী, মারীচ, গরুড়বাহন বিষ্ণু, হরগৌরী, গণেশ, কালী, সরস্বতী, নারদ প্রভৃতি এবং বন্দুকধারী সাহেব, তীরন্দাজ ব্যাধ, বর্মপরিহিত যোদ্ধা, বণিক্ প্রভৃতি। অনেকগুলি কুলঙ্গি এখন বিনষ্ট, তাই কিছু মিথুন-ভাস্কর্যের আভাসমাত্র পাওয়া যায়। সংস্কারের নামে 'টেরাকোটা'-সজ্জাগুলির উপর গোলাপী রঙের কলিচুন বুলিয়ে তাদের ক্ষতি করা হয়েছে।

শ্যামচাঁদপাড়ায় অবস্থিত পাঁচ-খিলানবিশিষ্ট, অলিন্দযুক্ত, দক্ষিণমুখী, আটচালা, শ্যামচাঁদ মন্দিরটি পশ্চিমবঙ্গের এ শ্রেণীর বৃহত্তম দেবালয়-গুলির অন্যতম। উঁচু পাদপীঠের উপর নির্মিত এ দেবালয়ের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা, যথাক্রমে ৫২ ফুট (১৫·৮ মি.) ৩৬ ফুট (১১ মি.) ও আনুমানিক ৭০ ফুট (২১·৩ মি.)। পশ্চিমপ্রান্তীয় খিলানের নীচে নিবদ্ধ পাথরের প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ :

"শ্রীমতঃ শ্যামচন্দ্রস্য মন্দিরং পূর্ণতাম···।
বসুবেদর্তু শুভ্রাংশুসংখ্যয়া গণিতে শকে ১৬৪৮॥"

অর্থাৎ, ১৬৪৮ শকে (১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে) শ্যামচন্দ্রের মন্দির সম্পূর্ণ হল। এখানে 'বসু'=৮, 'বেদ'=৪, 'ঋতু'=৬ এবং 'শুভ্রাংশু'=১ ধ'রে 'অঙ্কস্য বামাগতি' নিয়ম অনুসারে, প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৪৮ শকাব্দ। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বহুব্যয়ে নির্মিত হলেও, দেবালয়টিতে

'টেরাকোটা'-সজ্জা যৎসামান্য; খিলানগুলির প্রান্ত বরাবর প্রতীক শিবমন্দির ও প্রথম কার্ণিসের নীচে বাঁকানো দুই সারিতে বহু পোড়ামাটির পদ্ম উৎকীর্ণ আছে।

মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন স্থানীয় তন্তুবায় সম্প্রদায়ের ধনকুবের রামগোপাল খাঁচৌধুরী। সেই উপলক্ষে তিনি এখানে এক বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। দূরদূরান্ত থেকে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমন্ত্রিত হন। নদীয়ারাজ রঘুরাম রায় (কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা) এক লক্ষ মুদ্রা দর্শনী নিয়ে সভামঞ্চের প্রধানতম স্থানে উপবেশন করেন। শুধু মন্দির নির্মাণেই নাকি ব্যয় হয়েছিল দু লক্ষ টাকা। শ্যামচাঁদের বিগ্রহটি কষ্টিপাথরের নিত্যউপাসিত কৃষ্ণমূর্তি। বিগ্রহের পাদপীঠে রামগোপাল, রামজীবন, রামচরণ ও রামভদ্রের নাম ক্ষোদিত আছে। আদি রাধিকামূর্তিটি ছিল স্বর্ণনির্মিত। খাঁচৌধুরীদের পরিবারিক বিগ্রহ 'রাধাকান্ত'ও এখানে উপাসিত। মন্দিরের সামনে এক প্রশস্ত নাটমন্দির আছে। মন্দিরপ্রাঙ্গণ প্রাচীরবেষ্টিত।

কাঁসারীপাড়ায়, একই পাদপীঠের উপর নির্মিত, অলিন্দবিহীন, এক-দুয়ারী, দক্ষিণমুখী, দুটি আটচালা-মন্দিরের মাঝখানে একটি দালান-মন্দির অবস্থিত। আটচালা-মন্দির দুটিতে যাদবেশ্বর ও মাধবেশ্বর নামে কালোপাথরের দুটি শিবলিঙ্গ উপাসিত। এ মন্দির দুটির আয়তন একই—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা, যথাক্রমে, ১২ ফুট ৬ ইঞ্চি (৩·৯ মি.), ১০ ফুট ৬ ইঞ্চি (৩·৩ মি.) ও আনুমানিক ২০ ফুট (৬·১ মি.)। উভয় ক্ষেত্রেই, সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির মূর্তি ও অলংকরণাদি আছে। মূর্তিগুলি প্রবেশপথের দু পাশে ২২টি এবং উপরে ১২টি কুলঙ্গিতে নিবদ্ধ। শেষোক্ত মূর্তিগুলি নানা পোষাকপরিহিত রাজা এবং সামন্তরাজাদের। পাশের খোপগুলিতে আছে দশাবতার ও পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি। দালান-মন্দিরটিতে তিনটি প্রকোষ্ঠ। মাঝখানেরটিতে, কাঠের সিংহাসনে, কষ্টিপাথরের বেনুকৃষ্ণ ও অষ্টধাতুর রাধিকামূর্তি নিত্যপূজিত। 'বংশীধারী মন্দির' নামে পরিচিত এ দেবালয়ে কালো পাথরের এক শীতলামূর্তিও আছে। মন্দিরটিতে পঙ্খের সুন্দর অলংকরণ দেখা যায়।

মন্দির তিনটির পাদপীঠে একটি পাথরের প্রতিষ্ঠাফলকের লিপিটি নিম্নরূপ:

"অতিষ্ঠিপচ্ছিবস্তু দ্বে লিঙ্গে রাধে যুগেন্দুমে
মঠাভ্যাং বাণবস্বব্ধিচন্দ্রশাকে রবের্দিনে॥

শকাব্দা : ১৭৮৫ / ১৪ বৈশাখ

হরেমূর্ত্তিং রামযত্নুনাথদাসস্তথাকরোৎ।

অভ্রাক্ষিমে মুনীভাব্ধিভূমিশাকে বিধোর্দ্দিনে॥

শকাব্দা : ১৭৮৭ / ২০ আষাঢ়”

অর্থাৎ, ১৪ বৈশাখ ১৭৮৫ শকে (১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে), রবিবার, তুটি শিবলিঙ্গ এ তুটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হল। ২০ আষাঢ় ১৭৮৭ শকে (১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে), সোমবার, রামযত্নুনাথদাস কৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রথম লিপিটিতে 'যুগ' = ৪, 'ইন্দু' = ১, 'বাণ' = ৫, 'বসু' = ৮, 'অব্ধি' (সমুদ্র) = ৭ এবং 'চন্দ্র' = ১ ধ'রে প্রতিষ্ঠাকাল হয়েছে ১৪ বৈশাখ ১৭৮৫ ও দ্বিতীয় লিপিটিতে 'অভ্র' (আকাশ) = ০, 'অক্ষি' = ২, 'মুনি' = ৭ 'ইভ' (হাতি) = ৮, অব্ধি' = ৭ ও 'ভূমি' = ১ ধ'রে 'অঙ্কের বামাগতি' নিয়মে প্রতিষ্ঠাকাল দাঁড়িয়েছে ২০ আষাঢ় ১৭৮৭। প্রতিষ্ঠালিপি অনুসারে, শিবমন্দির তুটি দালান-মন্দিরটির তু বছর পূর্বে নির্মিত। এই মন্দিরচত্বরে আর একটি দালান-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও বিগুমান।

বউবাজারে, ১৭৭৯ শকাব্দে, অর্থাৎ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণাকালীর এক পঞ্চরত্ন-মন্দিরে সামান্য পঙ্খের অলংকরণ দেখা যায়।

চাঁতুনীপাড়ায় একটি ক্ষুদ্রাকার, দক্ষিণমুখী, আটচালা-শিবমন্দির আছে। মন্দিরগাত্রে, প্রবেশপথের উপরে, পোড়ামাটির সাধারণ ফুলকারি নকশা দেখা যায়। কোনও প্রতিষ্ঠাফলক নেই।

হাটখোলাপাড়ায় মধ্যমগোস্বামীবাড়িতে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর মন্দির এবং গোকুলচাঁদমন্দির নামে পরিচিত তুটি প্রতিষ্ঠালিপিহীন প্রাচীন, পোড়ামাটির ভাস্কর্যমণ্ডিত আটচালা-দেবালয় আছে। অদ্বৈতপ্রভুর মন্দিরটি ভিত্তিবেদীর উপর নির্মিত ও পূর্বমুখী। গর্ভগৃহের সামনে তিনটি পত্রাকৃতি খিলানযুক্ত আবৃত অলিন্দ আছে। থামগুলি বত্রিশ স্তর ইটের সমবায়ে গঠিত। অলিন্দের প্রবেশপথগুলি খুবই সংকীর্ণ। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫ ফুট (৪.৬ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফুট (৭.৬ মি.)। গর্ভগৃহে, সিংহাসনে, অদ্বৈতপ্রভু এবং তাঁর পত্নী সীতাদেবীর মূর্তি স্থাপিত। মন্দিরের সামনের দেওয়াল 'টেরাকোটা'-অলংকরণ ও মূর্তিসজ্জিত। মূর্তিগুলি পৌরাণিক ও সামাজিক। শেষোক্ত ভাস্কর্যগুলি পাদপীঠসংলগ্ন সমান্তরাল সারিতে উৎকীর্ণ—যথা, পালকি বা 'সুখাসন'বাহিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, শিকারদৃশ্য, তীরন্দাজ ব্যাধ ও ত্রস্ত

হরিণপালের পলায়ন প্রভৃতি। পৌরাণিক ভাস্কর্যের মধ্যে আছে, দশভুজা মহিষমর্দিনী (দেবীর দক্ষিণে গণেশ ও লক্ষ্মী এবং বামে কার্তিক ও সরস্বতী), দশাবতার, কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য, কালী, যমরাজ, নারদ প্রভৃতি। মূর্তিগুলি নিখুঁত এবং এখনও অক্ষত। নকাশি অলংকরণের বিষয়বস্তু ফুলপাতা ও জ্যামিতিক নকশা।

এ মন্দিরের উত্তর দিকে, গোকুলচাঁদের দক্ষিণমুখী, আটচালা-মন্দিরটিও পাদপীঠের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং গঠন ও আয়তনে অদ্বৈতপ্রভুর মন্দিরের অনুরূপ। (অতঃপর বিবৃত দেবালয়গুলি ছোট ব'লে তাদের আয়তনের মাপজোখ দেখানো হয়নি)। গর্ভগৃহের সামনে ত্রিখিলানযুক্ত আবৃত অলিন্দ। কোন প্রতিষ্ঠাফলক না থাকলেও শোনা যায়, মন্দিরটি ১৬৬২ শকাব্দে (১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে) স্থাপিত। বর্ধমান জেলার জামগ্রামের নন্দীদের পোষকতায় মন্দিরটি নাকি নির্মিত হয়েছিল। এ মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির মূর্তি ও অলংকরণাদি নেই, তবে পঙ্খের ফুলকারি ও জ্যামিতিক নকশা কিছু দেখা যায়। গর্ভগৃহে অদ্বৈতপ্রভুর অভিষিক্ত এবং ঘনশ্যাম গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত কষ্টিপাথরের রাধাবিনোদ বিগ্রহ, কাঠের গোকুলচাঁদ, পিতলের কয়েকটি রাধিকামূর্তি ও শালগ্রামশিলাদি আছে। মধ্যমগোস্বামীদের এই ঠাকুরবাড়ি ও অঙ্গন প্রাচীরবেষ্টিত। পূর্বোক্ত দেবালয় দুটি ছাড়া এখানে রামচন্দ্র বিগ্রহের একটি দালান-মন্দির (তার পুব দেওয়ালে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির কালীমূর্তিটি দ্রষ্টব্য) এবং প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে একটি নাটমন্দির আছে। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের পৌত্র মথুরেশের দ্বিতীয় পুত্র ঘনশ্যাম থেকে মধ্যমগোস্বামী (হাটখোলা) শাখার উৎপত্তি।

স্থানীয় বড়গোস্বামী শাখা হলেন শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের প্রপৌত্র মথুরেশের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘবেন্দ্রের বংশধরগণ। বড়গোস্বামীবাড়ির বিগ্রহ রাধারমণ এক দালান-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। সে মন্দিরের বেদীতে উৎকীর্ণ লিপি ঃ

"পুণ্যক্ষেত্র পুরীধামে শ্রীদোলগোবিন্দ
বিরাজিল কতকাল বিতরি আনন্দ।
বসন্তরায়ের প্রেমে যশোরাগমন,
যবে মানসিংহ করে রাজ্য আক্রমণ ॥
শ্রীঅদ্বৈতপৌত্র মথুরেশ মহামতি
আনিলেন শান্তিপুরে মোহন মুরতি।
জীবেরে করুণা করি' শ্রীরাধারমণ
শ্রীরাসবিহারী রূপে দিলেন দরশন ॥"

উৎকলীয় ভাস্কর্যরীতির এই বিগ্রহটি প্রথমে উড়িষ্যারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্তৃক 'দোলগোবিন্দ' (একক কৃষ্ণমূর্তি) নামে পুরীধামে প্রতিষ্ঠিত হয়। যশোহররাজ প্রতাপাদিত্য তাঁর খুল্লতাত বসন্ত রায়ের আদেশে পুরী থেকে সেটিকে যশোহরে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেন। শান্তিপুরের মথুরেশ ছিলেন এই বিগ্রহের পুরোহিতের গুরু। মানসিংহের যশোর আক্রমণের সময় মথুরেশ সেখানে ছিলেন। তিনি বিগ্রহটিকে শান্তিপুরে এনে নিজগৃহে নবরূপে 'রাধারমণ' নামে প্রতিষ্ঠা করেন। পরে নদীয়ারাজের পোষকতায় সেখানে এক রাধিকাবিগ্রহও স্থাপিত হয়।

শান্তিপুরের বিখ্যাত রাস উৎসবের প্রবর্তন হয় মথুরেশের সময় থেকে। রাঘবেন্দ্রপুত্র বিষ্ণুদেব রামভক্ত ছিলেন এবং তিনি এক রঘুনাথমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। রাঘবেন্দ্রের অপর পুত্র কালাচাঁদের অধস্তন তৃতীয় পুরুষ, কৃষ্ণকুমার গোস্বামী, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ষড়ভুজমূর্তি স্থাপন করেন। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রঘুনাথ বিগ্রহের জন্য এক পঞ্চচূড়-রথ ও ৮০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি দান করেন। এখানকার অন্যান্য বিগ্রহ—মদনমোহন, গোপাল, জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা।

স্থানীয় মদনগোপাল বা গোঁসাইগোবিন্দ বিগ্রহকে কেন্দ্র ক'রে বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। মূর্তিটি কাঠের এবং অদ্বৈতাচার্যের স্বপ্নাদিষ্ট। অদ্বৈতের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণ মিশ্র পিতার কাছ থেকে বিগ্রহটি পান এবং নাটমণ্ডপসংযুক্ত এক দালান-মন্দিরে সেটির প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেই প্রসিদ্ধ 'ধুলোট' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

মথুরেশের কনিষ্ঠ পুত্র রামেশ্বরের বংশধরেরা 'ছোটচাকাফেরা' গোস্বামী ('সীতানাথের বাটি') নামে পরিচিত। রামেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভ (রাধাকৃষ্ণ) বিগ্রহ এক দালান-মন্দিরে অবস্থিত। রাসের সময় এই বিগ্রহকে মধ্যস্থলে রেখে, এক গোলাকার কাঠের চাকার প্রান্তে স্থাপিত জোড়ায় জোড়ায় গোপগোপিনী মূর্তি পরস্পরের হাত ধ'রে ঘুরতে থাকেন ব'লে তাঁদের নাম হয় 'চাকাফেরা'। এ বংশের কৃষ্ণনাথ পণ্ডিত দালান-মন্দিরাদি নির্মাণ করেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এ বংশের হেফাজতে রক্ষিত আছে।

রামেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র সন্তোষের বংশধরেরা 'বাঁশবুনিয়া' উপশাখা। তাঁদের গৃহদেবতা শ্যামসুন্দর (কৃষ্ণমূর্তি) এবং গৌরনিতাই বিগ্রহ এক দালান-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত।

অদ্বৈতের পৌত্র কুমুদানন্দ আউলিয়া ('পাগলা') গোস্বামীশাখার আদিপুরুষ। শোনা যায়, নদীয়ারাজপ্রদত্ত সম্পত্তি ও সনদ প্রত্যাখ্যান

করার (বা বিনষ্ট হওয়ার) জন্য তাঁর 'আউলিয়া' নাম হয়। এ শাখার গৃহদেবতাদ্বয়, কৃষ্ণরায় ও কেশবরায়, এক দালান-মন্দিরে স্থাপিত। সেখান থেকেই শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় হরিচরণদাসকৃত 'অদ্বৈতমঙ্গল' নামের মূল পুঁথিটি সংগ্রহ ক'রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় দান করেন।

অদ্বৈতের পৌত্র দেবকীনন্দন 'আতাবুনিয়া' গোস্বামী-শাখার আদিপুরুষ। এ বংশকে 'বকুলতলা গোস্বামী-শাখা'ও বলা হয়। সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই বংশেরই সুসন্তান। কুলদেবতা শ্যামসুন্দর বিগ্রহের সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের অলৌকিক কাহিনী এ অঞ্চলে সুপ্রচলিত। নোয়াখালির জমিদার নরেন্দ্রকিশোর রায় কর্তৃক নির্মিত এক দালান-মন্দিরে বিগ্রহটি প্রতিষ্ঠিত। সেখানে বিজয়কৃষ্ণের সাধনগৃহও আছে।

রাণী ভবানীর বংশধর ও নাটোররাজ বিশ্বনাথ রায়ের স্ত্রী কৃষ্ণমণির গুরু ছিলেন অদ্বৈতপৌত্র মধুসূদনের বংশধর, প্রখ্যাত পণ্ডিত রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি। কৃষ্ণমণি তাঁর স্বামীর নামের প্রথম শব্দ 'বিশ্ব' এবং গুরুর নামের দ্বিতীয় শব্দ 'মোহন' মিলিয়ে এক মণিময় রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের নাম রাখেন 'বিশ্বমোহন'। ১২৫১ সনে একটি দালান-মন্দিরে সে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানকার ৩½ মণ ওজনের অষ্টধাতুর রাধিকামূর্তিটি বর্তমানে অপহৃত। এ দেবালয়ে বিজয়কৃষ্ণচন্দ্র নামে এক রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহও উপাসিত।

ওড়িশা-গোস্বামীদের আদিপুরুষ ছিলেন রাধাবল্লভ গোস্বামী। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধাতব নৃত্যগোপাল বিগ্রহ আর একটি দালান-মন্দিরে অধিষ্ঠিত।

প্রকাশ, স্থানীয় পটেশ্বরীতলায়, আনুমানিক ৫০০ বছর আগে, এক তান্ত্রিক সাধুসম্প্রদায় পটেশ্বরী কালীর প্রতিষ্ঠা করেন। রাসযাত্রার সময় সেখানকার পঞ্চমুণ্ডীর আসনে পটে আঁকা জয়াবিজয়া ও কালী প্রতিকৃতির পূজা হয়। পটের চালচিত্রে তিন তান্ত্রিক সাধুর প্রতিকৃতিও আঁকা থাকে। এই প্রতিকৃতির নামই 'পটেশ্বরী'।

তান্ত্রিকাচার্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের বংশধর রত্নগর্ভসার্বভৌম এখানে দীপান্বিতা অমাবস্যায় দক্ষিণাকালীমূর্তির পূজা প্রবর্তন করেন। বর্তমানে তিনি এক দালান-মন্দিরে দেবী আগমেশ্বরী নামে পূজিতা। তা ছাড়া এখানে 'মহিষখাগী', 'শ্যামাচাঁচুনী', 'ঘাটচাঁচুনী', সিদ্ধেশ্বরী এবং বিদ্ধেশ্বরী নামে লোকায়ত কালীমূর্তিও উপাসিতা। অদ্বৈতাচার্যের

সমসাময়িক শান্তমুনি গঙ্গাতীরে চৌগাছায় যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন তা এখন এক দালান-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। আর একটি দালান-মন্দিরে রজনীকান্ত মৈত্র প্রতিষ্ঠিত কাশীনাথ শিবলিঙ্গ পূজিত। সুবোধচন্দ্র মৈত্র কর্তৃক নির্মিত এক পঙ্খ-অলংকৃত একচূড়-মন্দিরে আর এক কালীমূর্তি উপাসিতা।

সূত্রাগড় এলাকায়, নদীয়ারাজ প্রতিষ্ঠিত এক দালান-মন্দিরে, 'গড়ের গোপাল' নামে পরিচিত এক কৃষ্ণমূর্তি আছে। তাছাড়া গোঁড়াই মণ্ডল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ এক চারচালা-শিবমন্দিরে অধিষ্ঠিত।

শান্তিপুর রেল-স্টেশনের কাছে লোহাযানতলায় বটবৃক্ষমূলে 'লোহাজাঙি' (লৌহযোনি ?) নামে এক দেবস্থানে কোন মূর্তি নেই ; তিনটি ছিদ্রযুক্ত গোলাকার প্রস্তরখণ্ড (চাকি) সেখানে লোকদেবী হিসাবে উপাসিতা। 'লোহা' শব্দটি কথ্যভাষায় 'নোয়া'-য় বিবর্তিত হয়ে হিন্দু সধবার হাতের লোহার বালাকে বোঝায়। সেই সূত্রে অনেকে মনে করেন, সতীর হাতের 'নোয়া' নাকি এখানে পড়েছিল।

এখানকার তোপখানা মসজিদটি আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের একেবারে শেষ দিকে, শান্তিপুরের তৎকালীন ধর্মপরায়ণ ফৌজদার গাজী মহম্মদ ইয়ার খাঁ নির্মাণ করেন। পুবমুখী এ ইমারতটির সামনের দিকের ত্রিখিলান প্রবেশপথের উপরের দেওয়ালে আরবী ও ফারসী হরফে পাশাপাশি-নিবদ্ধ তিনটি প্রস্তরফলকে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠালিপি-গুলি উৎকীর্ণ আছে ঃ

(আরবী লিপিতে)

"হু আল্লাহু বাদা কুল্লাশাইন	বিসমিল্লাহের রহমান-আর্‌রহিম লা ইলাহা ইল্লালাহো মহম্মদর্‌রসুল আল্লা	হু আল্লাহু কব্‌লা কুল্লাশাইন"

(বাংলা অনুবাদ)

আল্লাহ সর্ব-বস্তুর পশ্চাতে	পরম দাতা ও দয়ালু আল্লার নামে আরম্ভ, আল্লাহ্‌ ভিন্ন দ্বিতীয় আল্লাহ্‌ নাই এবং হজরত মহম্মদ তাঁহারই প্রেরিত	আল্লাহ্‌ সর্ব-বস্তুর অগ্রে

(ফারসী লিপিতে)

"চেরাগ ও মসজেদ ও মেহ্‌রাব ও মিম্বর
আবিবকর ও উমর ও উস্‌মান ও হায়দার
বেআহদে শাহান্‌শাহে আওরঙ্গজিব
বেনা করদাহ্‌ মসজেদ ও সদকে ও হাসিব
সদ্‌ ও পাঞ্চদা সাল বেশ আজ হাজার"

(বাংলা অনুবাদ)

প্রদীপ ও মসজিদ ও মেহ্‌রাব ও বেদী
যেন আবিবকর ও উমর ও উস্‌মান ও হায়দার।
আওরঙ্গজেব বাদশাহের রাজত্বকালে ১১১৫ হিজরীতে
মসজিদের এবং দান ও খয়রাতের বনিয়াদ তৈরি হল।

১১১৫ হিজরী ১৭০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দের সমার্থক। (আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয় ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে)। ভিত্তিবেদীর উপর স্থাপিত মসজিদটির একটি বড় গম্বুজ ও মোট আটটি ছোটবড় মিনার আছে।

আকবর বাদশাহের আমলে শান্তিপুরের সূত্রাগড়ে এক সেনানিবাস স্থাপিত হয়। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সৈয়দ মহ্‌বুব আলম (মতান্তরে, শৈয়দ হজরত শাহ্) বাগদাদ থেকে শান্তিপুরে আসেন। তিনিই স্থানীয় সৈয়দ (খোন্দকার) বংশের আদিপুরুষ। তিনি নাকি বাদশাহের গুরু ছিলেন এবং সমগ্র কোরাণ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। স্থানীয় সেনানিবাসে তখন ১,৩০০ পাঠান ও ৯০০ রাজপুত সৈন্য থাকত। তাদের ব্যয়নির্বাহের জন্য বাদশাহ্ সৈয়দ আলমকে প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করেন। তাঁরই আদেশে, সেনানিবাসের ফৌজদার ইয়ার খাঁ নাকি মসজিদটি নির্মাণ করেন। সে সময়ে সুবে বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন আওরঙ্গজেবের পৌত্র সুলতান আজিম-উস্-শান্। মসজিদটির কাছে ইয়ার খাঁ ও তাঁর পুত্রের সমাধি আছে।

দানবীর শরিবৎ সাহেব (জন্ম—১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) সামান্য অবস্থা থেকে বিত্তশালী হয়ে নতুনহাট এলাকায় দশ বিঘা জমির উপর ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কুড়ি হাজার টাকা ব্যয়ে এক মসজিদ ও অতিথিশালা নির্মাণ করেন। মসজিদটি এখনও বর্তমান।

ডাকঘরপাড়ার মসজিদটি প্রায় দু শ বছরের প্রাচীন এবং সেটির পাশে বিখ্যাত ফকির তোপ্‌সে মিঞার সমাধি অবস্থিত।

শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের দালান-মন্দিরটি ১৩০৪ বঙ্গাব্দে নির্মিত হয়। ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। পরে, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অঘোরনাথ গুপ্ত সে সমাজে যোগ দেন। আদি আচার্য পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের শিক্ষাগুরু ছিলেন এখানকার প্রখ্যাত পণ্ডিত রাধামোহন বাচস্পতি।

শান্তিপুর তাঁতশিল্পের জন্য বিখ্যাত। একদা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নাকি এখান থেকে প্রতিবৎসর বাইশ-তেইশ লক্ষ টাকার তাঁতবস্ত্র বিলাতে পাঠাত। সে সময়ে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে নির্মিত,

কোম্পানীর স্থানীয় কমার্সিয়াল রেসিডেন্সী কুঠির এখন কোন চিহ্ন নেই।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদে একটি পুরাকীর্তি সংগ্রহশালা আছে। সেখানকার পুরানিদর্শনের মধ্যে পদ্মের উপর দণ্ডায়মান, ২ ফুট ৩ ইঞ্চি (৬৮ সে.মি.) × ১ ফুট ৩ ইঞ্চি (৩৮ সে.মি.) × ১ ফুট ৩ ইঞ্চি (৩৮ সে.মি.) আয়তনের, কষ্টিপাথরের এক চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি ও ১ ফুট ৪ ইঞ্চি (৪১ সে.মি.) উচ্চতার কালো পাথরের একটি গরুড়মূর্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের পোড়ামাটির মূর্তি এবং অলংকরণযুক্ত ইট, টিপু সুলতানের ব্যবহৃত ব'লে বর্ণিত একজোড়া লিপিযুক্ত ধাতব দর্পণাধার, বহুসংখ্যক পুঁথি ও অন্যান্য কিছু পুরাবস্তুও এখানে সযত্নে রক্ষিত। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে স্থাপিত শান্তিপুর বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ সংগ্রহশালাতেও প্রচুর পুঁথি আছে।

শিকারপুর ঃ করিমপুর থানার অন্তর্গত এবং কৃষ্ণনগর থেকে বাসপথে ৫৮ মাইল (৯৩·৪ কি.মি.) উত্তর-পূর্বে, বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত গ্রাম।

এখানে সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্মস্থানে প্রাচীরবেষ্টিত ও প্রবেশতোরণযুক্ত একটি চতুষ্কোণ স্মৃতিস্তম্ভ আছে। তার পুব দিকের গায়ে প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ লিপিটি নিম্নরূপ ঃ

"শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুর
অধস্তন দশম পুরুষ
আচার্য
শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীপ্রভুজীউর
জন্মস্থল।
আবির্ভাব
শিকারপুর গ্রামে ১২৪৮ সালে
১৯শে শ্রাবণ, সোমবার,
ঝুলন-পূর্ণিমা।
তিরোভাব—শ্রীশ্রীপুরীধাম
সন ১৩০৬ সাল, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, কৃষ্ণাদ্বাদশী।"

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আবির্ভাব ও তিরোভাবদিবসে এখানে বিশেষ অনুষ্ঠানাদি হয়ে থাকে। ইতস্ততঃ কয়েকটি পরিত্যক্ত জীর্ণ অট্টালিকাও দেখা যায়।

শিবনিবাস ঃ কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত। কৃষ্ণনগর-মাজদিয়া বাসপথে, ১৬ মাইল (২৫·৮ কি.মি.) উত্তর-পুবে মন্দিরঘাটে নেমে, খেয়া নৌকায় চূর্ণী নদী পার হয়ে, সেখানে যাওয়া যায়।

নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে নসরত খাঁ নামে এক কুখ্যাত ডাকাত এখানকার গভীর জঙ্গলে সদলবলে বাস করত। কৃষ্ণচন্দ্র এখানে শিবির স্থাপন ক'রে তাকে দমন করেন। কিংবদন্তী, একদিন সকালে নদীতে মুখ ধোবার সময় একটি রুই মাছ কৃষ্ণচন্দ্রের সামনে এলে, তাঁর এক জ্ঞাতি বলেন যে, স্থানটি মহারাজের বাসের যোগ্য কেননা রাজভোগ্য সামগ্রী আপনা থেকেই তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্রও বর্গীর উৎপাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য নিরাপদ স্থানের সন্ধান করছিলেন। দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রের পরামর্শক্রমে, চূর্ণী নদীর দ্বারা 'কঙ্কনের আকারে পরিবেষ্টিত' (মতান্তরে, ওই ভাবে পরিখা খনন ক'রে) এই স্থানে তিনি রাজপ্রাসাদ ও শিবমন্দিরাদি নির্মাণ করেন। শিবের আলয় হিসাবে এই নতুন বসতির নাম হয় শিবনিবাস। ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গলে' আছে ঃ

"......কৃষ্ণচন্দ্র মতিমান।
কাশীতে করিবে জ্ঞানবাপীর সমান॥
বিগ্রহ ব্রহ্মণ্যদেব মূর্তি প্রকাশিয়া।
নিবাস করিবে শিবনিবাস করিয়া॥"

অতএব, শিবনিবাস মাহাত্ম্যে কাশীতুল্য। প্রচলিত ছড়ায় আছে ঃ

"শিবনিবাসী তুল্য কাশী ধন্য নদী কঙ্কনা।
উপরে বাজে দেবঘড়ি নীচে বাজে ঠঙনা॥"

কৃষ্ণচন্দ্র এখানে মহাসমারোহে অগ্নিহোত্র-বাজপেয় যজ্ঞ সম্পন্ন করেন এবং অগ্নিহোত্রী-বাজপেয়ী উপাধিতে ভূষিত হন। শোনা যায়, কৃষ্ণচন্দ্র এখানে নাকি ১০৮টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখন তার মাত্র পাঁচটি বর্তমান। অবশিষ্ট দেবালয়গুলির চিহ্নমাত্র না থাকায়, ১০৮টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার কাহিনী অতিশয়োক্তি মনে হয়।

এখানকার সবচেয়ে উঁচু দেবালয়টি সাধারণের কাছে 'বুড়োশিবে'র মন্দির নামে পরিচিত। শিবের আনুষ্ঠানিক নাম 'রাজরাজেশ্বর'। দেবালয়টি বাংলায় প্রচলিত মন্দির-রীতির কোনও শ্রেণীতে পড়ে না। অষ্টকোণ প্রস্থচ্ছেদের এ দেবগৃহের শিখর ছত্রাকার। খাড়া দেওয়ালের প্রতি কোণে মিনার ধরণের আটটি সরু থাম নির্মিত হয়েছে। স্থাপত্যের দিক থেকে অপ্রয়োজনীয় এই আলংকারিক স্তম্ভগুলিতে মুসলমানী

প্রভাব স্পষ্ট। উত্তর দিক ছাড়া আর তিন দিকে প্রবেশদ্বার আছে। প্রবেশদ্বারের খিলান ও অবশিষ্ট দেওয়ালে একই আকৃতির ভরাট-করা নকল খিলানগুলি 'গথিক'-রীতির স্মারক। দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে উঁচুতে নিবদ্ধ শিলাফলকে উৎকীর্ণ আছে ঃ

"১৬৭৬
যো জাতঃ খলু ভারতে স্থরতরুর্জ্যেষ্ঠাদিগীশাংশকে
সেনানীমুখবাজিরাজবিলসৎ সংখ্যাবতীদম্পুরে।
কৃত্বা মন্দিরমিন্দুচুম্বিশিখরং ভূপাল চূড়ামণিঃ
পৌত্রঃ শ্রীযুতকৃষ্ণচন্দ্র নৃপতিঃ শম্ভুং সমস্থাপয়ত্॥"

অর্থাৎ, ১৬৭৬ শকাব্দে (১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে) ইন্দুচুম্বী শিখরযুক্ত মন্দির নির্মাণ ক'রে নৃপশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র এখানে শম্ভুকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ৬ ফুট (১·৮ মি.) উঁচু, আটকোণা ভিত্তিবেদীর উপর স্থাপিত এ মন্দিরের আটটি খাড়া দেওয়ালের প্রতিটির প্রস্থ ১৭ ফুট ৩ ইঞ্চি (৫·৩ মি.) ও চূড়াসমেত সৌধটির উচ্চতা প্রায় ৮০ ফুট (২৪·৪ মি.)। বস্তুতঃ, এত উঁচু প্রাচীন দেবালয় পশ্চিমবঙ্গে আর আছে কিনা সন্দেহ। (মায়াপুরের যোগপীঠ মন্দিরটি বা বেলুড়-মঠ খুব উঁচু হলেও সম্প্রতিকালে নির্মিত)। কালো পাথরের শিবলিঙ্গটির উচ্চতা ৯ ফুট (২·৭ মি.) এবং spout-সমেত বেড় ২১ ফুট ১০ ইঞ্চি (৬·৭ মি.)। পূর্বভারতে এত বড় শিবলিঙ্গ আর নেই। শিবলিঙ্গের পাদপীঠে অস্পষ্ট বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ সংস্কৃত লিপিটির পাঠ নিম্নরূপ ঃ

"ত্রৈলোক্যপ্রগুণেন প্রতিষ্ঠিতো যো রামেণ রামেশ্বর স্তবৎ
শ্রীদ্বিজকৃষ্ণচন্দ্রকৃতিনা ভূরাজরাজাভিধাম্।
তদ্বৎ তাং দধতা স্বয়ং ত্রিজগতীনাথোঽপি সংস্থাপিতো নাম্না
ভক্তপরায়ণঃ সমভব্য শ্রীরাজরাজেশ্বরঃ॥

অর্থাৎ, ত্রিজগতে গুণাধিক রামচন্দ্র কর্তৃক যেমন রামেশ্বর (শিবলিঙ্গ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তেমনই কৃতী ব্রাহ্মণ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক পৃথিবীর রাজার রাজা সংজ্ঞা ধারণ ক'রে ত্রিজগতীনাথ (শিবলিঙ্গ) ভক্তপরায়ণ শ্রীরাজ-রাজেশ্বর নামে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ভৈমী একাদশী তিথিতে এই মন্দির প্রাঙ্গণে এক বিরাট মেলা বসে।

মূল মন্দিরের পুব দিকে, কিছু ব্যবধানে, আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট চারচালা-শিবমন্দির আছে। সেখানকার ৭½ ফুট (২·৩ মি.) উঁচু শিবলিঙ্গের নাম 'রাজ্ঞীশ্বর'। ৪ ফুট (১·২ মি.) উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর স্থাপিত এই বর্গাগার প্রস্থচ্ছেদের মন্দিরটির প্রতি দিকের দৈর্ঘ্য ২৬ ফুট

৪ ইঞ্চি (৮ মি.) ও উচ্চতা প্রায় ৬০ ফুট (১৮·৪ মি.)। উত্তর দিক ছাড়া অন্য তিন দিকে প্রবেশদ্বার আছে। পূর্ব দিকের ভিত্তির গায়ে নিবদ্ধ পাথরের অতি সুন্দর প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ ঃ

"১৬৮৪
যঃ সাক্ষাৎকৃতশৈবমূর্ত্তিবসুধেশানাংশকে সম্ভবাত্
সংখ্যাতঃ ক্ষিতিদেবরাজপদভাক্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ প্রভুঃ।
তস্য ক্ষৌণিপতে দ্বিতীয়মহিষী মূর্ত্তেব লক্ষ্মীঃ স্বয়ং
প্রাসাদপ্রবরে প্রসাদসুমুখং শম্ভুং সমস্থাপয়ত্॥"

অর্থাৎ ১৬৮৪ শকে (১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, যিনি শিবাংশে জন্মগ্রহণ ক'রে পৃথিবীর দেবরাজপদ লাভ করেছিলেন, তাঁর দ্বিতীয়া মহিষী, যিনি স্বয়ং মূর্তিমতী লক্ষ্মীর মত, তিনি এই উৎকৃষ্ট হর্ম্যে প্রসন্নবদন শিবকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এখানে 'কৃত' = ৪, 'শৈবমূর্তি = ৮ ও 'বসুধেশ' = ১৬ ধ'রে প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৮৪ শকাব্দ।

এ মন্দিরের পুব দিকে, সামান্য ব্যবধানে, ৮ ফুট (২.৪ মি.) উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত রামসীতার পশ্চিমমুখী চারচালা-মন্দির। মূল দেবালয়ের দৈর্ঘ্য ৪২ ফুট (১২.৮ মি.), প্রস্থ ৩২ ফুট (৯.৮ মি.) ও উচ্চতা প্রায় ৫০ ফুট (১৫.২ মি.)। চারদিকে প্রসারিত দালানটি সম্ভবতঃ পরে যোগ করা হয়েছে। চালার প্রতিটি পিঠ ত্রিভুজাকার না হয়ে অনেকটা ঘণ্টার লম্বচ্ছেদের মত বিরল আকৃতির। দালানের পাঁচটি প্রবেশ-খিলান ও গর্ভগৃহের তিনটি প্রবেশ-খিলান 'গথিক'-স্থাপত্যানুগ। শিখরমূলের চার কোণে চারটি সরু, আলংকারিক মিনার আছে। গর্ভগৃহে, কাঠের সিংহাসনে, কালো পাথরের উপবিষ্ট রামচন্দ্র ও পাশে দণ্ডায়মানা সীতাদেবী। এ ছাড়া ৪ ফুট (১.২ মি.) উচ্চতার একটি শিবলিঙ্গ, রাধাকৃষ্ণ, কালী, গণেশমূর্তি প্রভৃতিও আছে। পশ্চিমের দেওয়ালে নিবদ্ধ শিলালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ ঃ

"১৬৮৪
দেবঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ ক্ষিতিপতিতিলকো ব্রহ্মরাজর্ষিবংশে
যোঽসৌ ভূকল্পশাখী শ্রুতিবসুবসুধেশাংশকে তুল্যসংখ্যে।
প্রেয়স্যাস্তন্মহিষ্যাঃ পরমকৃতিকৃতে জানকীলক্ষ্মণাভ্যাং
প্রাসাদে প্রাদুরাসীৎ ত্রিজগদাধিপতি শ্রীযুত রামচন্দ্রঃ॥

অর্থাৎ, ১৬৮৪ শকে (১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে) ব্রাহ্মণ-রাজর্ষিবংশজাত নৃপতিশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রদেব তাঁর প্রিয় মহিষীর সুন্দর সৌধে জানকী ও লক্ষ্মণের সঙ্গে ত্রিভুবনপতি রামচন্দ্রকে আবির্ভূত (প্রতিষ্ঠিত)

করেছিলেন। এখানে 'শ্রুতি' = ৪, 'বসু' = ৮ এবং 'বসুধেশ' = ১৬ ধ'রে 'অঙ্কের বামাগতি' নিয়মে প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৮৪ শকাব্দ।

এ মন্দিরের দক্ষিণ দিকে লুপ্ত কোন মন্দির থেকে আহৃত একটি শিবলিঙ্গ দেখা যায়। মন্দিরের সামনের অলিন্দের উত্তর প্রান্তে ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি (১·১ মি.) × ১ ফুট ৩ ইঞ্চি (৩৮ সে. মি.) আয়তনের একটি কালো পাথরের বিষ্ণুমূর্তি রক্ষিত আছে। শোনা যায়, সেটি নাকি একদা চূর্ণীতীরে পাওয়া গিয়েছিল।

বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাস্টের অর্থানুকূল্যে, ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে, ১৯৬৫-৬৬ সালে এ মন্দির তিনটির সংস্কার করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এখানেও প্রাচীন দেবালয়গুলিকে গোলাপী রঙের প্রলেপে আবৃত না করলেই শোভন হত।

স্থানীয় জুনিয়ার হাই স্কুলের কাছে এক দক্ষিণমুখী, জীর্ণ, চারচালা-মন্দিরে কালো পাথরের গর্দভাসীনা শীতলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত। চালার আকৃতি রামসীতা মন্দিরের মতই অভিনব। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২ ফুট (৩·৭ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ২০ ফুট (৬·১ মি.), এ দেবালয়ের ছাদ গর্ভগৃহের কোণে লহরাযুক্ত গম্বুজের উপর স্থাপিত। দক্ষিণ, পুব ও পশ্চিম দিকের তিনটি প্রবেশদ্বারের খিলান 'গথিক'-স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত। কোন প্রতিষ্ঠাফলক না থাকলেও, মন্দিরটি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বলেই মনে হয়। পাথরের শীতলামূর্তি পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

শীতলা মন্দিরের সিকি মাইল (০·৪ কি. মি.) পশ্চিমে, দক্ষিণমুখী আর একটি চারচালা-শিবমন্দির দেখা যায়, যার দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ১২ ফুট ৬ ইঞ্চি (৩·৯ মি.) ও উচ্চতা প্রায় ৪০ ফুট (১২·২ মি.)। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটিও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্তি। দেওয়ালে অল্প গভীরতার বহু কুলঙ্গি ও কিছু পঙ্খের কাজ ছাড়া অন্য অলংকরণ নেই। এ মন্দিরে ৫ ফুট (১·৫ মি.) উচ্চতার কালো পাথরের এক উপাসিত শিবলিঙ্গ আছে।

মূল মন্দির তিনটির অদূরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাসাদের জঙ্গলাকীর্ণ অবশেষ এখনও দেখা যায়। তার অনেকাংশ বর্তমানে মাটির নীচে প্রোথিত। রাজপ্রাসাদটি নাকি খুব সুরক্ষিত ও দুর্গের আকারে নির্মিত ছিল ব'লে জনশ্রুতি। কাছেই অশ্বশালা, হস্তীশালা ইত্যাদির চিহ্ন আজও বিদ্যমান। প্রকাশ, কৃষ্ণচন্দ্র শিবনিবাসে রাজপুরীর পত্তন ক'রে প্রথমে রাজপ্রাসাদটি নির্মাণ করেন। পরে, ১৭৫৪-১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মন্দিরগুলি নির্মিত হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগর থেকে শিবনিবাসগামী অধুনালুপ্ত রাজপথের দু ধারে ক্ষুদ্র চারচালা-মন্দিরের অনুকরণে বহু তুলসীমঞ্চ নির্মাণ করেন। শিবনিবাসের কাছে এরূপ দুটি প্রাচীন তুলসীমঞ্চ এখনও অক্ষত আছে।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ জুন, কলকাতার বিশপ, রেভারেণ্ড হেবার, জলপথে ঢাকা যাবার সময় শিবনিবাসের মন্দির ও রাজপ্রাসাদাদি দেখে মুগ্ধ হন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত তাঁর স্মৃতিকথায় ('Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India, Vol-1, 1824-1825' by the Right Rev. Reginald Hebber, Lord Bishop of Calcutta. Published by John Murray, London) তিনি শিবনিবাসের হিন্দু মন্দিরগুলিকে সুরম্য ও অতি উত্তম স্থাপত্যের নিদর্শন ব'লে বর্ণনা করেছেন। তাদের নির্মাণে 'গথিক' খিলানের ব্যবহার তাঁকে বিস্মিত করে। অধুনা লুপ্তপ্রায় স্থানীয় রাজপ্রাসাদটি তখনই কিছুটা জীর্ণ ও জঙ্গলাবৃত হলেও, তিনি 'গথিক'-রীতির সুউচ্চ প্রবেশদ্বারটিকে 'ক্রেমলিন'-এর প্রধান তোরণের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং অকপটে স্বীকার করেছেন যে, সেই বিস্তীর্ণ প্রাসাদের মনোরম নির্মাণশৈলী তাঁকে 'কনওয়ে কাস্‌ল্' ও 'বোল্‌টন অ্যাবী'র কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। বিশপ হেবারের মত বিদগ্ধ পর্যটকের এহেন উচ্চ সুখ্যাতি এবং ইউরোপীয় স্থাপত্যের সঙ্গে শিবনিবাসের মন্দির ও হর্ম্যাদির সপ্রশংস তুলনা বিশেষ অভিনিবেশের দাবী রাখে।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে, রাণাঘাটের কৃষ্ণপান্তির ভাগিনেয় স্বরূপ সরকার-চৌধুরী নদীয়ারাজের কাছ থেকে শিবনিবাসের জমিদারী ক্রয় করেন। নবদ্বীপের বিপরীত পারে গঙ্গাতীরস্থ স্বরূপগঞ্জের নাম হয়েছে তাঁর নামানুসারে। তাঁর পুত্র বৃন্দাবন সরকার নীলবিদ্রোহের সময় নীলচাষীদের পক্ষ অবলম্বন ক'রে খ্যাত হন। শিবনিবাসে মরমী সাধক জাফর খাঁর সমাধি আছে। সকল শ্রেণীর মানুষ সেখানে পূজা দেন, মানত করেন।

শ্রীনগর : চাকদহ থানার অন্তর্গত। চাকদহ রেল-স্টেশন থেকে চাকদহ-বনগাঁ বাসপথে ৯ মাইল (১৪.৫ কি.মি.) পুবে বেলে (বালিয়া) গ্রাম। সেখান থেকে কাঁচা রাস্তায় ৩ মাইল (৪.৮ কি.মি) দক্ষিণে শ্রীনগর গ্রামটি অবস্থিত।

নদীয়ারাজ রাঘব আনুমানিক ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে মর্দানা গ্রামের প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর বাসের জন্য সেখানে রাজপ্রাসাদ ও মন্দিরাদি নির্মাণ ক'রে সে স্থানের নামকরণ করেন শ্রীনগর। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পর্যন্ত নদীয়ারাজেরা এখানকার রাজবাড়িতে বাস করেছেন।

পরে, মহামারীর প্রকোপে এই গ্রাম পরিত্যক্ত হয়। রাজপ্রাসাদটি এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। চারদিকের পরিখায় জল নেই; সেখানে চাষাবাদ হয়। সম্ভাব্য শত্রুর গতিবিধি নিরীক্ষণের জন্য উঁচু জমির উপর স্থাপিত কয়েকটি পর্যবেক্ষণ-সৌধের ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। সাবেক গ্রামের পাশের মরালী নদী এখন মজে গেছে।

রাজা রাঘব এখানে পোড়ামাটির কারুকার্যমণ্ডিত যে দক্ষিণমুখী, চারচালা-শিবমন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন বর্তমানে তা ভগ্ন ও জঙ্গলাকীর্ণ। আদিতে প্রতিষ্ঠাফলক ছিল; এখন নেই। শিবলিঙ্গও অন্তর্হিত। শুধু দক্ষিণ দিকের দেওয়ালটি জীর্ণ অবস্থায় কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে। সে দেওয়ালে পোড়ামাটির জ্যামিতিক ও ফুলকারি নকশার চিহ্ন দেখা যায়। প্রবেশপথের উপরে, দু সারিতে, ২৮টি এবং দু পাশে ২০টি কুলঙ্গি এখনও বর্তমান, কিন্তু তার একটিতেও পোড়ামাটির মূর্তি নেই। আনুমানিক ৪ ফুট (১.২ মি.) উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর স্থাপিত এ দেবালয়টি দৈর্ঘ্যে ২০ ফুট (৬.১ মি.), প্রস্থে ১৬ ফুট (৪.৯ মি.) ও উচ্চতায় হয়ত ৩০ ফুটের (৯.২ মি.) মত ছিল।

এখানে আর একটি উত্তরমুখী, জীর্ণ, আটচালা-শিবমন্দির আছে। ১½ ফুট (৪৬ সে.মি.) উঁচু ভিত্তির উপর নির্মিত এ দেবালয়ের দৈর্ঘ্য ১৬ ফুট (৪.৯ মি.), প্রস্থ ১৪ ফুট (৪.৩ মি.) ও উচ্চতা প্রায় ২৫ ফুট (৭.৬ মি.)। এখন প্রবেশদ্বারের উপরে পোড়ামাটির একটি গণেশমূর্তি ও দু পাশে শুধু দুটি পদ্ম আছে। আগে, প্রবেশপথের উপরে, এক সারিতে ১৪টি এবং দু পাশে ১৮টি কুলঙ্গিতে 'টেরাকোটা'-মূর্তি ছিল; এখন শূন্য কুলঙ্গিগুলি আছে, কোন মূর্তি নেই। বর্তমানে মন্দিরটি সংস্কার ক'রে শিবলিঙ্গ পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়মের সহকারী সংগ্রহাধ্যক্ষ শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত আমাদের জানিয়েছেন যে, রাণাঘাট থেকে সংগৃহীত দুটি শিলালিপি ওই সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। প্রথমটির আকার—২ ফুট ১⅛ ইঞ্চি × ৯⅜ ইঞ্চি (৬৪ × ২৪ সে. মি.) তার এক পিঠে বঙ্গাক্ষরে ক্ষোদিত লিপিটি নাকি নিম্নরূপ ঃ

"১৫৯৬
শাকে রস গ্রহশর দ্বিজরাজ সংখ্যে
সংখ্যাবদম্বুজ বিজৃম্ভন ভানুবিম্বঃ
শ্রীরাজবল্লভ ইতী নিজ নির্ম্মিতে স্মি
ন্ন স্থাপয়ং পরমবেশ্মনি বিশ্বনাথং ॥"

দ্বিতীয়টি আকার—১ ফুট ১ ইঞ্চি × ৮½ ইঞ্চি (৩৩ × ২১ সে. মি.) তারও এক পিঠে বঙ্গাক্ষরে ক্ষোদিত লিপিটি নাকি নিম্নরূপ ঃ

"১৫৯৩
শাকে রামাঙ্ক বাণে
ন্দৌ রাজেন্দু রিহ রাঘবঃ
রাঘবেশ্বর নাসানং ম
ধ্ধ শিবম তিষ্ঠি পত ॥"

প্রথমটির শুদ্ধ পাঠ ঃ

"১৫৯৬
শাকে রসগ্রহশরদ্বিজরাজসংখ্যে
সংখ্যাতবদম্বুজ বিজৃম্ভন ভানুবিম্বঃ
শ্রীরাজবল্লভ ইতি নিজ নির্ম্মিতে ইস্মি
ন্ন স্থাপয়ৎ পরমবেশ্মনি বিশ্বনাথং ॥"

অর্থাৎ ১৫৯৬ শকে (১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে) ('রস' = ৬, 'গ্রহ' = ৯, 'শর' = ৫ ও 'দ্বিজরাজ' > চন্দ্র = ১ ; অঙ্কের বামাগতিতে, ১৫৯৬), সূর্যের প্রভায় পদ্ম যেমন বিকশিত হয়, তেমন প্রখ্যাত শ্রীরাজবল্লভ নিজ নির্মিত উৎকৃষ্ট মন্দিরে বিশ্বনাথ (শিবলিঙ্গ)কে স্থাপন করলেন ।

দ্বিতীয়টির শুদ্ধ পাঠ ঃ

"১৫৯৩
শাকে রামাঙ্ক বাণেন্দৌ
রাজেন্দুরিব রাঘবঃ
রাঘবেশ্বর নামানং
মধ্যে শিবম প্রতিষ্ঠিতঃ ॥"

অর্থাৎ ১৫৯৩ শকে (১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে) ('রাম' = ৩, 'অঙ্ক' = ৯, 'বাণ' = ৫ ও 'ইন্দু' = ১ ; অঙ্কের বামাগতি অনুসারে, ১৫৯৩), বৈশাখ মাসে, চন্দ্রের ন্যায় রাজা রাঘব রাঘবেশ্বর নামে শিব (লিঙ্গ) প্রতিষ্ঠা করলেন।

'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় (ত্রয়োবিংশ ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩২৩ সন) শ্রীগুরুদাস সরকারের 'শ্রীনগর' প্রবন্ধে (পৃঃ-২৫৭) উল্লেখ আছে যে, এই শিলালিপি দুটি শ্রীনগরে অবস্থিত দুটি মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-ফলক এবং শ্রীনগর থেকেই সে দুটি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালার জন্য আহৃত হয় ।

এখানকার অপর উল্লেখ্য পুরাকীর্তি, গাজীতলায় গাজীর সমাধির পাশে রক্ষিত একটি ভগ্ন প্রস্তরমূর্তি। আয়তনে ২ ফুট × ১ ফুট

(৬১ সে. মি. × ৩০'৫ সে. মি.), সেটির অলংকৃত পাদপীঠে সাপের মাথায় পদ্ম, তার উপরে মূর্তির একটি পদ স্থাপিত। পাশে গরুড়। পিছনের পিঠে আরবী হরফে তিন লাইনের একটি লিপি উৎকীর্ণ আছে। হরফের আকার বেশ বড়। এটি প্রকাণ্ড কোন বিষ্ণুমূর্তির নীচের অংশ হওয়া সম্ভব। শ্রীগুরুদাস সরকারের মতেও ('শ্রীনগর' প্রবন্ধ ; 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', ত্রয়োবিংশ ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩২৩ সন), এটি বিষ্ণুমূর্তির পাদপীঠ এবং তিনি অনুমান করেন, এটি একদা কোন মসজিদ-সংলগ্ন ছিল। মূর্তিটি কিভাবে এখানে এসেছে তা জানা যায় না। কাছাকাছি কোথাও কোন মসজিদও নেই। শ্রীযুত সরকার আরবী লিপির পাঠোদ্ধার ক'রে লিখেছেন, সেটি গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ। লিপিটির তিনি বাংলা অনুবাদ দিয়েছেন ঃ "পরম শক্তিমান ভগবান কহিয়াছেন, মসজিদসমূহ নিশ্চয়ই ঈশ্বরের, ঈশ্বর ব্যতীত অপর কাহারও আরাধনা করিও না।…আমাদিগের ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তি—ভগবানের কৃপা তাঁহার প্রতি বর্ষিত হউক… বলিয়াছেন…আবুল মুজাফর হোসেন শাহ্ ভগবান তাঁহাকে ও তাঁহার রাজ্য ও রাজত্বকে রক্ষা করুন।"

সরাপপুর ঃ চাকদহ থানার অন্তর্গত। চাকদহ রেল স্টেশন থেকে বাসপথে ৮ মাইল (১২'৯ কি.মি.) পুবে রসুল্লাপুর। সেখান থেকে কাঁচা রাস্তায় ২ মাইল (৩'২ কি.মি.) দূরে সরাপপুর অবস্থিত।

এখানে একটি প্রাচীন বটগাছের নীচের উঁচু জমিতে ভূপ্রোথিত একটি প্রকাণ্ড অবয়বহীন কালো পাথর 'পোড়া মহেশ্বর' নামে পরিচিত এবং শিবলিঙ্গ হিসাবে পূজিত। এই লৌকিক দেবতাকে কেন্দ্র ক'রে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত। শোনা যায়, একদা এক সন্ন্যাসীর দ্বারা দগ্ধ হওয়ায় তাঁর নাম হয়েছে 'পোড়া মহেশ্বর'। আদিতে তিনি নাকি এক মন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিলেন যার কোন চিহ্ন এখন দেখা যায় না। বর্তমানে তাঁর জন্য এক দালান-মন্দির নির্মিত হয়েছে। তার ছাদ টিনের, দেওয়াল ও ভিত্তি ইটের। শিবরাত্রিতে এখানে মেলা বসে। 'নদীয়া কাহিনী'তে উল্লেখ আছে ঃ "ভগ্নাবশেষ মন্দিরের ভিত্তি ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত মৃত্তিকাস্তূপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উহা যে পূর্বে ইষ্টকনির্মিত বহু গৃহপ্রাঙ্গণ ও চত্বরবেষ্টিত সমৃদ্ধিশালী দেবালয় ছিল তাহা স্পষ্টই লক্ষিত হয়।"

সাধুবাজার ঃ তেহট্ট থানার অন্তর্গত ও কৃষ্ণনগর-করিমপুর বাসপথে বেতাই থেকে ১ মাইল (১'৬ কি. মি.) দক্ষিণে অবস্থিত।

এখানে পোড়ামাটি ও পঙ্খের অলংকরণযুক্ত একটি পরিত্যক্ত, জীর্ণ মসজিদ আছে। আয়তাকার এক উচ্চভূমির উপর জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে মসজিদটির অবস্থান। প্রতিষ্ঠাফলক নেই। তবে 'টেরাকোটা' ও পঙ্খের কারুকার্যের যুগপৎ উপস্থিতি থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, পোড়ামাটির সজ্জার অবনতি ও পঙ্খের কাজের সূত্রপাতের কালে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের প্রথম দিকে বা তার পরে, ইমারতটি নির্মিত হয়ে থাকবে। নদীয়া জেলায় 'টেরাকোটা'-অলংকরণযুক্ত এটিই সম্ভবতঃ একমাত্র মসজিদ। কাছেই একটি প্রাচীন, ভগ্ন কোঠাবাড়িও দেখা যায়।

অদূরে অসংখ্য ঝুরিযুক্ত প্রাচীন বটগাছতলাটি 'পীরতলা' নামে পরিচিত। সেখানে হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে মানত করে, হাতেগড়া পোড়ামাটির ঘোড়া ভেট দেয়। বটগাছের শিকড় তেল-সিঁদুর লেপা। এই পীরতলায় মানত করলে নাকি মানুষ ও পশুপাখির রোগ সারে।

সুন্দলপুর ঃ করিমপুর থানার অন্তর্গত এবং কৃষ্ণনগর-গোপালপুরঘাট বাসপথে কৃষ্ণনগর থেকে ৫৩ মাইল (৮৫·৩ কি. মি.) উত্তর-উত্তরপুবে অবস্থিত।

মুর্শিদাবাদ সদর দেওয়ানী আদালতের এককালীন প্রধান বিচারপতি এবং মুর্শিদাবাদ ও নশীপুরের দেওয়ান, কৃতকর্মা শ্যামসুন্দর দাস-সরকার (১১৩৮-১২২৮ সন) এখানে ১১৯৭ বঙ্গাব্দে পঙ্খের অলংকরণযুক্ত ও তিন কুঠরিবিশিষ্ট একটি দালান-মন্দিরে বিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠা ক'রে তাঁদের সেবা প্রবর্তন করেন। প্রথম কাঠের সিংহাসনে আছেন দারুনির্মিত শ্রীমহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ, পিতলের দ্বাদশগোপালমূর্তি এবং নারায়ণশিলা। দ্বিতীয় সিংহাসনে আছেন কাঠের তৈরী বংশীধারী কৃষ্ণ ('বৃন্দাবনবিহারী দেবঠাকুর' নামে পরিচিত) এবং রাধিকা। তৃতীয় সিংহাসনে আছেন দারুনির্মিত বিনোদবিহারী এবং রাধিকাবিগ্রহ। আয়তাকার একটি পিতলের পাতে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রামূর্তিও ক্ষোদিত আছে। তা ছাড়া লোহার একটি আবদ্ধ আধারে আছে ভারতের সব তীর্থের বারি এবং প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে লিখিত সংস্কৃত শ্রীমদ্ভাগবত (সেবাইতদের মতে, শ্রীচৈতন্যলিখিত ব'লে অনুমিত)। বিগ্রহগুলিকে উৎসবাদির সময় স্বর্ণ ও রৌপ্যালংকারে ভূষিত করা হয়। তাঁদের জন্য দোলমঞ্চ ও রাসমঞ্চও আছে। দোলের সময় এখানে বিরাট মেলা বসে। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম জেলা জুড়ে এসব বিগ্রহের দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। ৪ পৌষ ১২২৫ সনে (১৯ জুলাই ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে) শ্যামসুন্দর দাস-সরকার এই বিগ্রহাদির সেবার জন্য মুর্শিদাবাদে এক অর্পণনামা সম্পাদন করেন।

সরকারবাড়িতে শ্যামসুন্দর দাস-সরকার কর্তৃক ব্যবহৃত পোষাক ও অন্যান্য পুরাবস্তু রক্ষিত আছে।

স্থানীয় মৈত্রপাড়ায় গঙ্গারাম মৈত্র প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমমুখী, পঞ্চরত্ন জোড়া-শিবমন্দিরটি জীর্ণ এবং ভগ্ন। মন্দিরে সাদা ও কালো পাথরের দুটি শিবলিঙ্গের এখনও নিত্যপূজা হয়। মধ্যস্থলের চূড়া দুটি যে গম্বুজাকার সেকথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পোড়ামাটির অলংকরণ নেই, তবে পঙ্খের সামান্য কারুকার্য দেখা যায়। এ মন্দিরের উত্তর দিকে এক ভগ্ন পূজার দালান আছে।

এখানকার বাগপাড়ায় ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত রামব্রহ্ম বাগ দক্ষিণমুখী, একচূড়-শিবমন্দিরটি আনুমানিক ১২৬২ বঙ্গাব্দে (১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, এ মন্দিরের চূড়াটিও গম্বুজাকার। চারদিকের দেওয়ালে পঙ্খের অলংকরণ আছে। সংযুক্ত দালান-মন্দিরে মৃণ্ময়ী, দশভুজা, দুর্গামূর্তির পূজা হয়ে থাকে। দুর্গার লোকায়ত নাম 'বুড়ী-মা'। এ মন্দিরের শালের কড়িকাঠে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে দুর্গাস্তোত্র ক্ষোদিত আছে।

স্থানীয় সরকারপাড়ায় রজনীকান্ত বাগ প্রতিষ্ঠিত দুটি দক্ষিণমুখী, সংযুক্ত চারচালা-শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গ নিত্যপূজিত। দেবালয় দুটিতে কোনও অলংকরণ নেই। একই পাড়ায়, প্রাচীন ভৈরব নদের পাড়ে, একটি শিবমন্দির ছিল। সেটি নিশ্চিহ্ন হবার পর, সাবেক ভিত্তির উপর নতুন ক্ষুদ্রাকার এক একরত্ন-মন্দিরে শিবলিঙ্গটি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বর্তমানে লুপ্ত এখানকার এক নীলকুঠি থেকে প্রাপ্ত একটি শিলমোহরে উৎকীর্ণ আছেঃ "Cootee Sundonpore 1850"। অনেকে সেজন্য গ্রামটির নাম সুন্দনপুর বা সুন্দরপুরও ব'লে থাকেন।

সুবর্ণবিহারঃ কোতোয়ালী (কৃষ্ণনগর) থানার অন্তর্গত এবং কৃষ্ণনগর শহর থেকে ৪ মাইল (৬.৪ কি. মি.) পশ্চিমে কৃষ্ণনগর-স্বরূপগঞ্জ বাসপথের ধারে অবস্থিত।

সুবর্ণবিহার প্রাচীন স্থান; নবদ্বীপমণ্ডলের গোদ্রুমদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত। অনেকের মতে, এখানে পালরাজাদের আমলে বা তার পূর্বে কোন বৌদ্ধবিহার ছিল, যেহেতু বিহার অর্থে বৌদ্ধ মঠ বোঝায়। সম্রাট অশোকের কালে সুবর্ণদ্বীপ নামে এক বৌদ্ধধর্ম প্রচারকেন্দ্রের উল্লেখও পাওয়া যায়। শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর সেখানকার অধ্যক্ষরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। সুবর্ণদ্বীপ এবং সুবর্ণবিহার একই স্থান ব'লে অনুমিত।

এখানকার এক সুপ্রাচীন ধ্বংসস্তূপ সম্পর্কে 'নবদ্বীপ-মহিমা'য় শ্রীকান্তিচন্দ্র রাঢ়ী লিখেছেন: "ইহা একটি ধ্বংসীভূত স্তূপ। এই স্তূপ প্রায় ২ বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া অবস্থিত এবং উচ্চতায় প্রায় ১০ হাত হইবে। ইহা ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ডময়। ইহার উত্তর দিকের ভূমি বহুদূর পর্যন্ত প্রস্তরখণ্ডে পরিপূর্ণ। এই স্তূপের মধ্যস্থানে পুষ্করিণীর ন্যায় একটি প্রকাণ্ড গহ্বর আছে। তাহার পরিমাণ প্রায় ৩ কাঠা হইবে ও গভীরতাও ৮/৯ হাত হইবে। এই গহ্বরের চারিদিকে উচ্চ জঙ্গলাবৃত ভূমি ইহাকে বাঁধের ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে। অতি বর্ষাতেও ইহার মধ্যে বৃষ্টিজল জমিয়া থাকে না—অল্পকাল মধ্যেই শুষ্ক হইয়া যায়। এই গহ্বরের কেন্দ্রস্থলে একখণ্ড গোলাকার প্রস্তর প্রোথিত আছে। তাহার অল্পাংশই মাটির উপর দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার শিরোদেশ শিলকুটানোর ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট।...এখানে প্রস্তরনির্মিত বিশাল পুরী ছিল।...এখানকার স্তূপের উপর ইষ্টকময় ভিত্তি ও ভিত্তির উপর খিলানের পরিবর্তে একখণ্ড প্রস্তর স্থাপিত ছিল।...স্তূপের উত্তরাংশে লাফালাফি করিলে পূর্বে গুমগুম শব্দ পাওয়া যাইত—যেন তাহার তলদেশ ফাঁপা। · কৃষকেরা ঐ স্থান খনন করে ও উহার অভ্যন্তরে এক অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠ দেখিতে পায়। তাহার মধ্য হইতে কতকগুলি দ্রব্য লইয়া বাহিরে আসে। কয়েক পাত্র চাউলও তাহার সঙ্গে ছিল। চাউলগুলির অবস্থা প্রস্তরীভূত। পরে, ঐ দিকের ভিত্তিগাত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, ঐ স্থান মৃত্তিকাবৃত ও উচ্চ হইয়াছে।" এখানকার স্তূপের ইট ও পাথরে নাকি গঙ্গাবাসের রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগরের গোবিন্দ সড়কের কিছু অংশও এই ইট-পাথরে তৈরী। 'ভক্তিরত্নাকর' নামক বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, শ্রীনিবাস আচার্য ঈশানঠাকুরকে সুবর্ণবিহার দেখিয়েছিলেন।

বর্তমানে সুবর্ণবিহারে যাঁতার অর্ধাংশের আকারে নির্মিত একটি এবং দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৩ ফুট × ৮ ইঞ্চি (৯২ সে. মি. × ২০ সে. মি.) আর একটি কালো পাথর পড়ে আছে। প্রাচীন কোন পাথরের ইমারতের অংশ, ৭ ফুট ১০ ইঞ্চি (২.৪ মি.) দীর্ঘ ও ১ ফুট ৭ ইঞ্চি (৪৯ সে. মি.) প্রস্থ একটি পাথরের চৌকাঠও দেখা যায়। মহেশগঞ্জ কুঠিবাড়িতে (ফুলবাগানে) সুবর্ণবিহার থেকে প্রাপ্ত নানা আকারের কারুকার্যমণ্ডিত বহু প্রস্তরখণ্ড রক্ষিত আছে। এ ছাড়া আছে কারুকার্যখচিত একটি বৃহৎ স্তম্ভের অর্ধাংশ। এখানকার বারোয়ারিতলায় ও 'ট্যাংরা মসজিদে'র কাছে কিছু কিছু প্রস্তরখণ্ড এখনও ছড়ানো রয়েছে। কিন্তু এ

ধ্বংসস্তূপ থেকে আজ পর্যন্ত কোন বৌদ্ধ বা অন্য মূর্তি পাওয়া যায়নি।

অনেকে মনে করেন, সুবর্ণ রাজার নাম অনুসারে সুবর্ণবিহার নাম হয়েছে। 'গোবিন্দচন্দগীতে' বৌদ্ধ নৃপতি 'সুবন্নচন্দ রাজার' উল্লেখ আছে। আবার আর এক বৌদ্ধ সামন্ত রাজা, 'সুবর্ণচন্দ্র', নাকি চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করতেন। এ দুই নৃপতিই পালরাজাদের সমসাময়িক ব'লে প্রকাশ। এসব তথ্য ঐতিহাসিকভাবে সত্য হলে, সুবর্ণবিহারের প্রাচীনত্ব পালরাজত্বের সমকালীন হতে পারে। আর এক লোকশ্রুতি অনুসারে, সুবর্ণ নামে কুম্ভকারজাতীয় এক রাজা এখানে রাজত্ব করতেন। একদা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে তিনি সপরিবারে মাটির নীচে এক নিরাপদ গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে মহলে যাতায়াতের পথের খবর জানতেন শুধু তাঁর গুরু যিনি নাকি পিছনে প'ড়ে শত্রুহস্তে নিহত হন ও রাজার পাতালসমাধি ঘটে। অপর জনশ্রুতি—সুবর্ণবিহার রাজা সুবর্ণসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তিনি বৈষ্ণবপূজার ফলে বিষ্ণুপূজার অধিকার পান এবং ভগবদ্‌প্রাণ হন। প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এই সুবর্ণ রাজার নাম অনুসারে এখানে এক গৌড়ীয়মঠ স্থাপন করেন। মঠটি এখনও আছে। কিন্তু এ কাহিনীর প্রথমাংশ কতদূর সত্য বলা যায় না।

সোনাডাঙা ঃ নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত ও শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথের সোনাডাঙা স্টেশন বা ৩৪ নং জাতীয় সড়কের সোনাডাঙার মোড় থেকে ১ মাইল (১·৬ কি. মি.) পশ্চিমে অবস্থিত।

এখানে সিংহরায় উপাধিধারী জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত একটি অন্নপূর্ণার মন্দির আছে। মন্দিরটি বর্গাকার দ্বিতল দালানের উপর স্থাপিত পঞ্চচূড়াযুক্ত। চারপাশের দেওয়ালে সিমেন্টের বড় আকারের পৌরাণিক দেবদেবীমূর্তি ও অলংকরণ উৎকীর্ণ ; যথা—দশভুজা দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, কালী, কালীয়দমন, মহাদেব এবং রামরাবণের যুদ্ধদৃশ্য প্রভৃতি। বিগ্রহ অষ্টধাতুর অন্নপূর্ণামূর্তি ও নারায়ণশিলা।

এ মন্দিরের পাশে বাঁধানোঘাটসহ একটি প্রাচীন পুষ্করিণী দেখা যায়। তীরে সিংহরায় জমিদারদের জীর্ণ বসতবাড়ি। তার প্রবেশতোরণের একটি কড়িকাঠে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে ক্ষোদিত আছে ঃ "শ্রীশ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা নামে ভব ভয়াবনাশ/করে শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসের এই অভিলাষ। সন ১২৪৯ সাল।" সিংহরায়বংশধরদের কাছে অনুসন্ধানে জানা যায়, সুদক্ষ মিস্ত্রী প্রাণকৃষ্ণ দাস এই মন্দির-অট্টালিকাদি নির্মাণ করেছিলেন।

হরধাম ঃ রাণাঘাট থানার অন্তর্গত এবং রাণাঘাট রেল-স্টেশন থেকে ৭ মাইল (১১·৩ কি.মি.) দক্ষিণ-পশ্চিমে, চূর্ণী নদীর দক্ষিণ তীরে, অবস্থিত। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই গ্রামের পত্তন ও নামকরণ করেন এবং এখানে রাজপ্রাসাদ, মন্দির ও নওবতখানাদি নির্মাণ করেন। 'নদীয়া কাহিনী'তে রাজবাড়িটিকে "চতুস্তল পরিমিত প্রকাণ্ড প্রাসাদ" এবং "অতিশয় বৃহৎ ও পরম সুদৃশ্য" ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানীয় পুরাকীর্তিগুলি বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত এবং পরিত্যক্ত।

কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয়া মহিষীর গর্ভজাত একমাত্র শম্ভুচন্দ্রই এখানে অবস্থান করেন এবং পুরুষানুক্রমে তাঁর বংশধরেরাই এখানে বাস ক'রে আসছেন। এই শাখা-বংশই কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ শোণিতসম্পর্কিত। শম্ভুচন্দ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এখানে আনিয়ে তাঁদের বহু ব্রহ্মোত্তর নিষ্কর ভূমি দান করেন।

শম্ভুচন্দ্রের মধ্যম পুত্র পৃথ্বীচন্দ্রের পত্নী রাধামণি দেবী ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এখানে পঙ্খের অলংকরণযুক্ত একটি দক্ষিণমুখী চারচালা-মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে চিণ্ময়ী নামে কষ্টিপাথরের কালীমূর্তি স্থাপন করেন। মন্দিরের পাথরের প্রতিষ্ঠাফলকে উৎকীর্ণ আছে ঃ

শ্রীলশ্রীশম্ভুচন্দ্রদ্বিজবরনৃপতেরাত্মজোমধ্যমোঽসৌ
শ্রীপৃথ্বীচন্দ্রদেবো নৃপপুরহরধামাস্য পত্নী দ্বিতীয়া
শ্রীমদ্রাধামণিঃ স্বং পতিমনুপরমাং কালিকাং চিণ্ময়ীতি
তৌলাদ্ যা বাণবস্বশ্বশশিমিতশকেঽস্থাপয়ন্মন্দিরেঽস্মিন ॥

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ নৃপতি শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্রের মধ্যমপুত্র হরধামরাজ শ্রীপৃথ্বীচন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীযুক্তা রাধামণি পতিবিয়োগের পর, সাদৃশ্য-বশতঃ চিণ্ময়ী নামে পরম কালিকাকে ১৭৮৫ শকে স্থাপন করলেন। ('বাণ'=৫, 'বসু'=৮, 'অশ্ব'=৭ এবং 'শশী'=১ ঃ অঙ্কের বামাগতি অনুসারে ১৭৮৫ শক অর্থাৎ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ।)

চাকদহ থানার অন্তর্গত সুখসাগর গ্রামে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এক চারচালা-মন্দির নির্মাণ ক'রে উগ্রচণ্ডী (বা সিদ্ধেশ্বরী) নামে পাথরের এক কালীমূর্তি স্থাপন করেন। বহুদিন পূর্বে মন্দিরটি গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হলে, মূর্তিটি হরধামের চিণ্ময়ী মন্দিরে রক্ষিত হয়। বর্তমানে চিণ্ময়ী এবং উগ্রচণ্ডী (সিদ্ধেশ্বরী) নদীয়ারাজবংশের হরধাম-শাখার বংশধর যোগেশচন্দ্র রায়ের রাণাঘাট ছোটবাজারের নিকটস্থ বাড়িতে এক দালান-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা এবং নিত্যপূজিতা।

হরধামের উত্তরে, চূর্ণীর অপর তীরে, আনন্দধাম গ্রামটিও নদীয়ারাজ

কৃষ্ণচন্দ্র একই সময়ে পত্তন ও নামকরণ করেন। সেখানেও এক রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। কৃষ্ণচন্দ্রের প্রথমা মহিষীর কনিষ্ঠপুত্র ঈশানচন্দ্র এখানে বাস করতেন। এখন বাস করেন তাঁর বংশধরেরা।

হাঁসখালী ঃ হাঁসখালী থানার সদর এবং কৃষ্ণনগর থেকে বগুলাগামী পাকা সড়কে ১০ মাইল (১৬·১ কি.মি.) পুবে, চূর্ণী নদীর তীরে, অবস্থিত।

এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য, হাজরাতলায় হাজরাগাছের নীচে হাজরাঠাকুরের থান। গাছটি প্রাচীন, লতানে এবং শাখাপ্রশাখায় বহুদূর বিস্তৃত। ফলের আঁষটে গন্ধ থেকে এটিকে আঁষফল গাছও বলা হয়। শোনা যায়, আগে এখানে নাকি অবয়বযুক্ত একটি প্রস্তরখণ্ড হাজরাঠাকুর নামে উপাসিত হত। পাথরটি আর নেই ব'লে গাছটিকেই এখন পূজা করা হয়ে থাকে। স্থানীয় শিবের 'হাজরা' নামটি লোকায়ত। ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলাকাব্যে শিব' গ্রন্থে (পৃঃ-৭৭) লিখেছেন ঃ "…হ্যাঁচড়া ফোড়া-পাঁচড়ার ধন্বন্তরী। ইনি মারীদেবতা ও কৃষিঘনিষ্ঠ। এঁর সঙ্গে শিবের যোগ হয়। হ্যাঁচড়ার গানে শিব বন্দিত হয়েছেন। নদীয়ার হাজরার সঙ্গে এই হ্যাঁচড়া দেবতার সম্পর্ক হয়ত ছিল ; দু জনেই কৃষিদেবতা।" কিন্তু হাঁসখালীর হাজরাঠাকুর শুধুমাত্র রোগহর দেবতা নন। অপুত্রকেরাও পুত্রকামনায় তাঁর কাছে পূজা দেন। শনি-মঙ্গলবার তাঁর পূজার দিন। তা ছাড়া চৈত্রসংক্রান্তির আগের দিন, অর্থাৎ নীলপূজার দিন, মধ্যরাত্রে তাঁর সাড়ম্বরে পূজা হয়। হাজরাঠাকুর শিব এবং কালরুদ্রধ্যানে উপাসিত। আগে তাঁর প্রীত্যর্থে পাঁঠাবলি হত, এখন কুমড়ো বলি হয়। পূজার প্রধান উপচার শোল মাছ, আতপ চালের ভাত, মাসকলাই সিদ্ধ এবং নানা প্রকার ঋতুলভ্য ফল। গাজন-সন্ন্যাসীদের মত হাজরাঠাকুরের উপাসকেরাও পনরো দিন একবেলা উপবাসী থেকে পূজা দেন। আগে শুধু যাদব-গোপ, বর্গক্ষত্রিয় ও রাজবংশীরা উপাসক হতেন ; এখন সকলেই হন। মুসলমান মহিলারাও এখানে চিনিদুধ ঢালেন। হাজরাঠাকুরের মূল সন্ন্যাসী ৺বিষ্ণু ঘোষ এই লৌকিক দেবতার জন্য পঙ্খের সাধারণ অলংকরণযুক্ত, ইটের, পুবমুখী, ছোট, একটি চারচালা-মন্দির নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন। মন্দিরে, হাজরাতলায় প্রাপ্ত, এক পঞ্চমুখী শঙ্খও আছে।

হাজরাতলায় চৈত্রমাসে শোনা যায় নদীয়ার বিশিষ্ট লোকগীতি 'বোলান গান'। কৃষিপ্রধান নদীয়ার অন্যতম প্রধান উৎসব শিবের গাজন

বা চড়ক। গাজন-সন্ন্যাসীদের গাওয়া গানের নাম 'বোলান'। এই সন্ন্যাসীদের 'বালা' নামেও অভিহিত করা হয়। সেজন্য 'বালা'র গানকে বলা হয় 'বোলান' বা 'বালাকি'। 'বোলান' অর্থে জবাব দেওয়াও বোঝায়। গানের মধ্য দিয়েই উত্তর-প্রত্যুত্তর চলে। গাজন-চড়ক-হাজরাপূজা অনুষ্ঠানের উল্লেখ্য অংশ—সন্ন্যাসীদের নানাপ্রকার দেহলাঞ্ছনা; যথা, বাণফোঁড়া, ঝাঁপান, শালেভর, পাটভাঙা, মশান, শবনৃত্য, কাঁটাঝাঁপ, জিবফোঁড়া প্রভৃতি। 'বোলান গান' মুখে মুখে রচিত হয়। এই আনুষ্ঠানিক লোকগীতি ভাবমূলক নয়, আখ্যানমূলক। ঢোল-কাঁসি বাজনার সঙ্গে পায়ে ঘুঙুর প'রে সন্ন্যাসীরা 'বোলান' গেয়ে থাকেন। এ গানে শুধু শিবের স্তুতিই থাকে না রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের কাহিনী, কৃষ্ণলীলা, শচী-নিমাইলীলা ও সমাজের কথাও স্থান পায়। 'বোলান গানে' বৈষ্ণবরস ও হরিভক্তিরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে। নিকটবর্তী গাজনা গ্রামেও গাজনের সময় 'বোলান গান' শোনা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী

'কৃষ্ণনগর' —পৌরসভা শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ : কৃষ্ণনগর, ১৯৬৪

ঘোষ, বিনয় —পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি : কলিকাতা, ১৯৫৭

চৌধুরী, আবুল আহ্‌সান —লালন স্মারকগ্রন্থ : ঢাকা, ১৯৭৪
—কুষ্টিয়ার বাউল সাধক : ঢাকা, ১৯৭৪

দত্ত, অক্ষয়কুমার —ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) : কলিকাতা

দাস, বৃন্দাবন —শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

দাস, হরিদাস —মধ্যযুগীয় গৌড়ীয় সাহিত্যের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অভিধান : নবদ্বীপ, ৪৬৫ শ্রীগৌরাব্দ

'নদীয়া' —স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ : কৃষ্ণনগর, ১৯৭৩

নাথ, রাধাগোবিন্দ (সম্পাদিত) —শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত : কলিকাতা, ১৯৫৮

পূর্ববঙ্গ রেলপথ, প্রচার বিভাগ —বাংলায় ভ্রমণ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) : কলিকাতা, ১৯৪০

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার —বাঁকুড়ার মন্দির : কলিকাতা, ১৩৭১
—বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি : কলিকাতা, ১৩৮২
—দেখা হয় নাই : কলিকাতা, ১৩৮০

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস —বাঙ্গালার ইতিহাস (প্রথম ভাগ), তৃতীয় সংস্করণ : কলিকাতা

বেদান্তশাস্ত্রী, হৃষীকেশ (সম্পাদিত) —সিতাগুণকদম্ব—বিষ্ণুদাস আচার্য বিরচিত (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) : কলিকাতা, ১৩৪৬

ভট্টাচার্য, কালীকৃষ্ণ —শান্তিপুর পরিচয় (প্রথম ভাগ) ১৩৪৪, (দ্বিতীয় ভাগ) ১৩৪৯ : কলিকাতা

ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র —বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা : বাঙালীর সারস্বত অবদান : কলিকাতা, ১৩৫৮

মজুমদার, রমেশচন্দ্র —বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ) : কলিকাতা, ১৩৬৭
—(মধ্য যুগ) : কলিকাতা, ১৩৭৩

মল্লিক, কুমুদনাথ —নদীয়া কাহিনী : কলিকাতা, ১৩১৯

মিত্র, অশোক (সম্পাদিত) —পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) : দিল্লী, ১৯৬৮

মিত্র, সতীশচন্দ্র —যশোহর খুলনার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) : ১৯৬৩, (দ্বিতীয় খণ্ড) : ১৯৬৫

মিত্রমুস্তৌফী, সুজননাথ —উলা বা বীরনগর : কলিকাতা, ১৩৩৩
—উলার মুস্তৌফী বংশ : উলা, ১৩৩৭

মুখোপাধ্যায়, রাজীবলোচন —মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং (দ্বিতীয় সংস্করণ) : কলিকাতা, ১৩৪৭

রাঢ়ী, কান্তিচন্দ্র —নবদ্বীপ মহিমা : নবদ্বীপ, ১৩৪৪
—শ্রীশ্রীনবদ্বীপতত্ত্ব : নবদ্বীপ

রায়, কার্তিকেয়চন্দ্র —আত্মজীবনচরিত : কলিকাতা, ১৩৬৩
—ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত : কলিকাতা, ১৮৭৬

রায়, নীহাররঞ্জন —বাঙালীর ইতিহাস(আদিপর্ব): কলিকাতা, ১৩৫৬

রায়, ভারতচন্দ্র —গ্রন্থাবলী ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ : কলিকাতা, ১৩৫৭

শাস্ত্রী, শিবনাথ —রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : কলিকাতা, ১৯০৯

সেন, দীনেশচন্দ্র —বৃহৎ বঙ্গ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) : কলিকাতা, ১৩৪১, ১৩৪২

Bhattacharya, Jogendranath —Hindu Castes and Sects : Calcutta, 1896.

Blochman (Translated) —Ain-i-Akbari (Vols. I & II).

Brown, Percy —Indian Architecture : Bombay.

Chakrabarti, Chintaharan & Ghosh, Pareshnath (Edited) —Krishnagar College Centenary Commemoration Volume : Krishnagar, 1948.

Calendar of Persian Correspondence —(Vol. I), 1759-1769 : National Archives of India.

Garrett, J. H. E. —Bengal District Gazetteers : Nadia : Calcutta, 1910

Hunter, W. W. —A Statistical Account of Bengal (Vol.—II) : London, 1875.

Kramrisch, Stella —The Art of India : London, 1954.

Maulavi, Abdus Salam (Translated) —Riaz-us-Salatin.

McCutchion, David J. —Late Mediaeval Temples of Bengal : Calcutta, 1972.

Mitra, Asok —Census 1951 : West Bengal District Handbook : Nadia.

Roy, B. —Census 1961 : West Bengal District Handbook : Nadia.

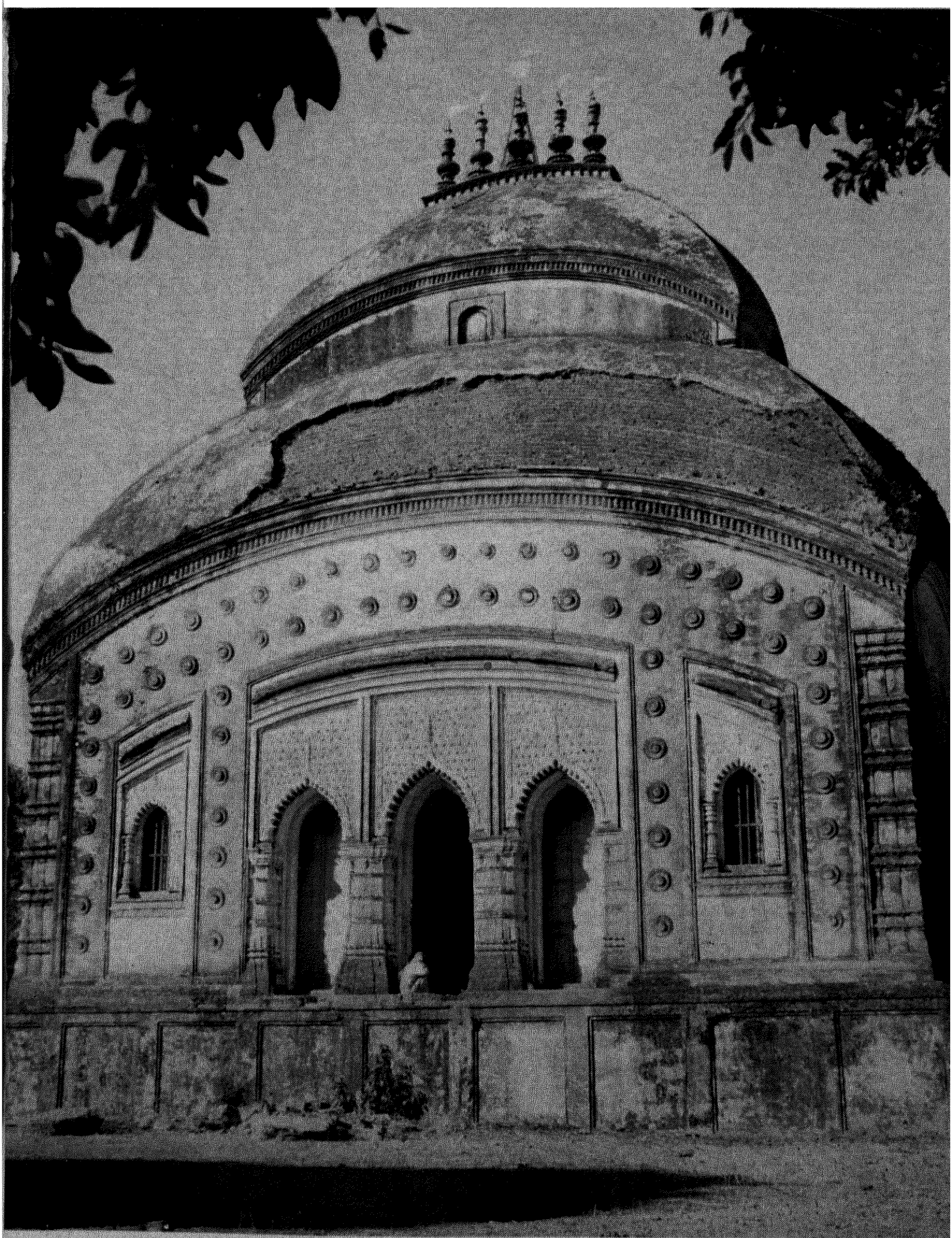
Roymond, M. (Translated) —Seir-Mutaqherin (Vols.—I & II) : 1902.

অনুক্রমণিকা*

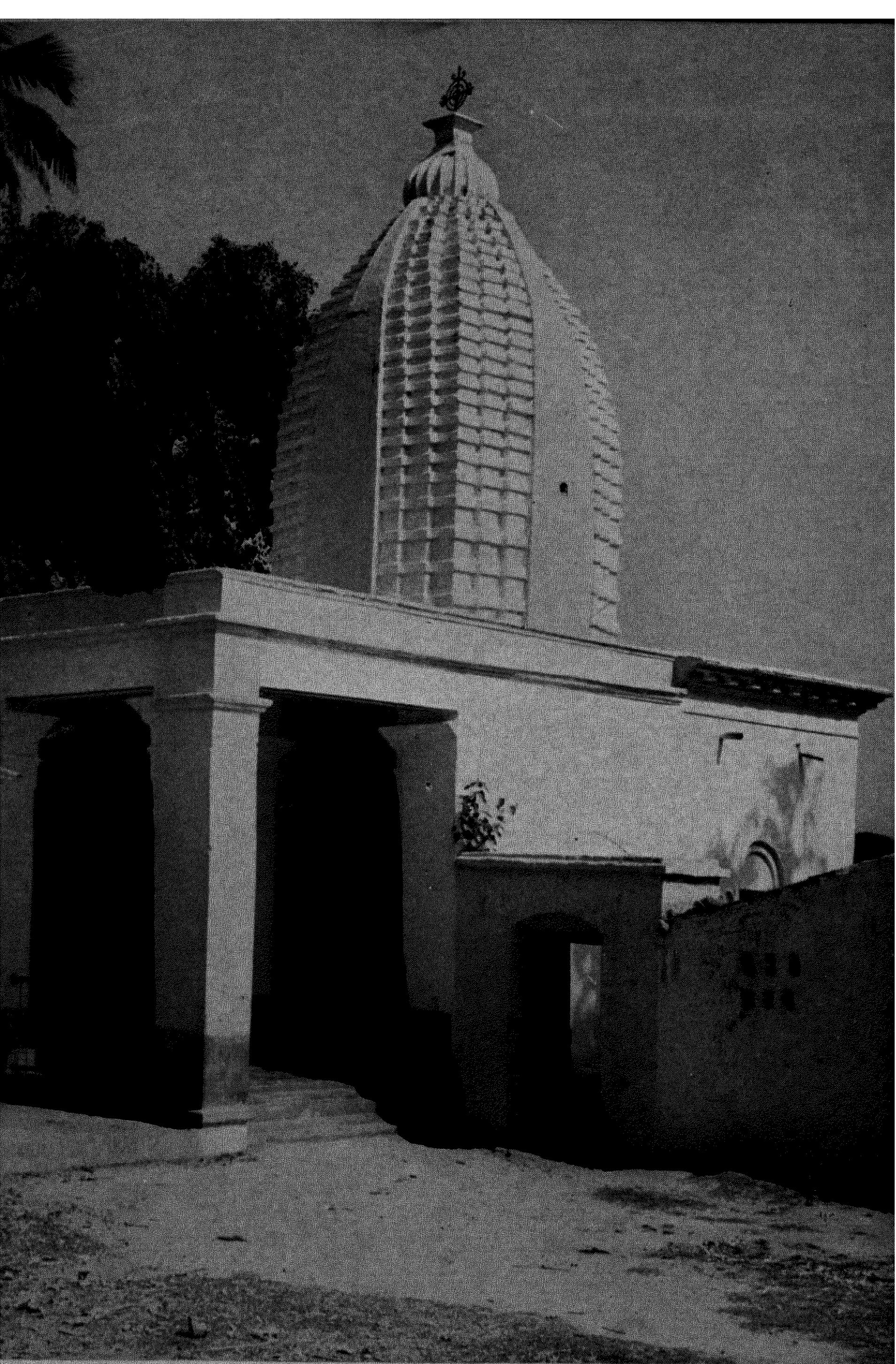
*স্থানবাচক নামগুলি পৃষ্ঠা উল্লেখ ক'রে সূচীপত্রে দেখানো হয়েছে ব'লে অনুক্রমণিকার অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

আলোকচিত্র

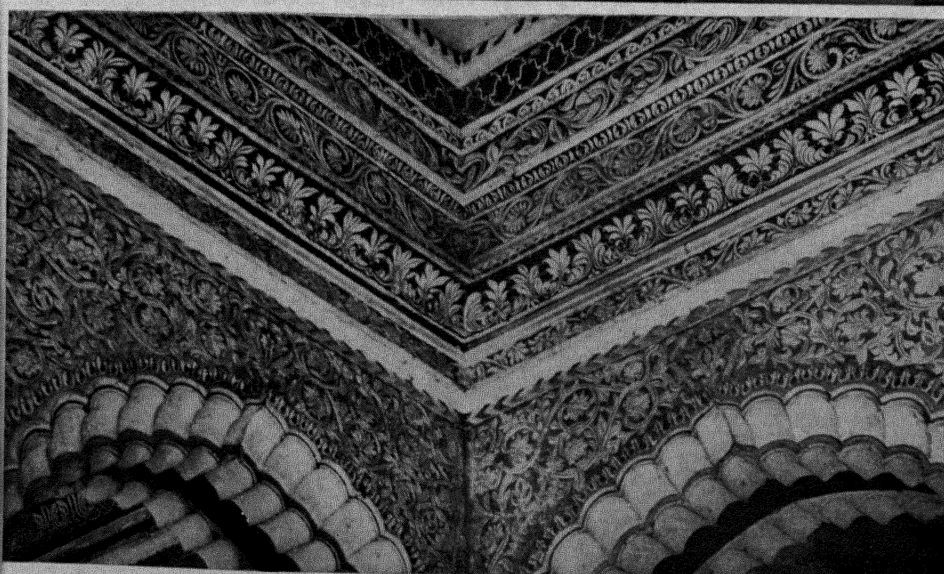
[পরবর্তী আলোকচিত্রগুলি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল (৩ এবং ৪ নং), শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায় (৫, ১৪ এবং ২৩ নং), ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (১৫ নং), পশ্চিমবঙ্গ পুরাতত্ত্ব অধিকার (১৬ নং) ও অবশিষ্ট ২৩টি শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত এবং সেগুলির সর্বস্বত্ব, যথাক্রমে, তাঁদের দ্বারা সংরক্ষিত। ১৫ ও ১৬ নং ছবি দুটি ছাড়া অন্য ছবিগুলি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ব-পরিকল্পিত 'লে-আউট' অনুসারে, তাঁর নিজস্ব 'ডার্ক-রুমে' পরিস্ফুটিত ক'রে এ পুস্তকে ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন।]



(১) কৃষ্ণরায়ের বৃহদায়তন আটচালা-মন্দির : কাঞ্চনপল্লী (পৃ: ২৪-২৫)

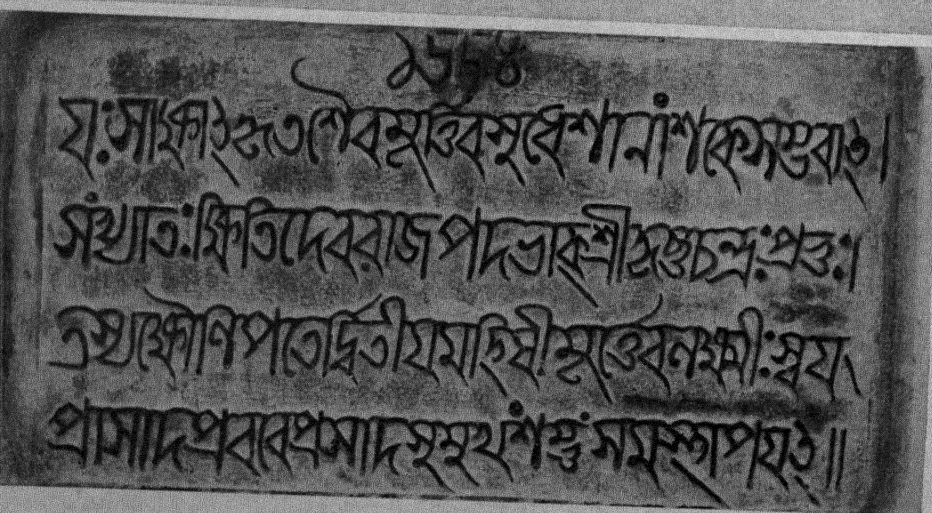


(২) গৌরনিতাই-এর দেউলশিখর দালান-মন্দির : কুলিয়া (পৃঃ ২৬-২৭)



(৩) রোমান ক্যাথলিক গির্জা : কৃষ্ণনগর (পৃঃ ২৯)

(৪) রাজবাড়ির পুজামণ্ডপে পঙ্খের সজ্জা : কৃষ্ণনগর (পৃঃ ২৭)



১৬৭৪

যঃসাঙ্গাঙ্গুতশৈবমূর্ত্তিবসুধেশানাং শকেসংবত্ ।
সংখ্যাতঃক্ষিতিদেবরাজপদভাক্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃপ্রভুঃ।
তস্যক্ষৌণিপতের্দ্বিতীয়মহিষীসুত্তেবনক্ষ্মীঃস্বয়ং
প্রাসাদপ্রবরেপ্রসাদসুমুখশম্ভুং সমস্থাপয়ত্ ॥

(৫) কৃষ্ণরায়ের জোড়বাংলা-মন্দির : তেহট্ট (পৃঃ ৩৪-৩৫)
(৬) রাজ্ঞীশ্বর শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি : শিবনিবাস (পৃঃ ১০০)

(৭) রাঘবেশ্বর শিবমন্দির : দিগ্‌নগর (পৃঃ ৩৬-৩৭)
(৮) উল্লিখিত মন্দিরের 'টেরাকোটা' সজ্জার নিদর্শন (পৃঃ ৩৬-৩৭)



(৯) দিগুনগর মন্দিরে পোড়ামাটির অপরূপ 'শালভঞ্জিকা' মূর্তি (পৃঃ ৩৬)



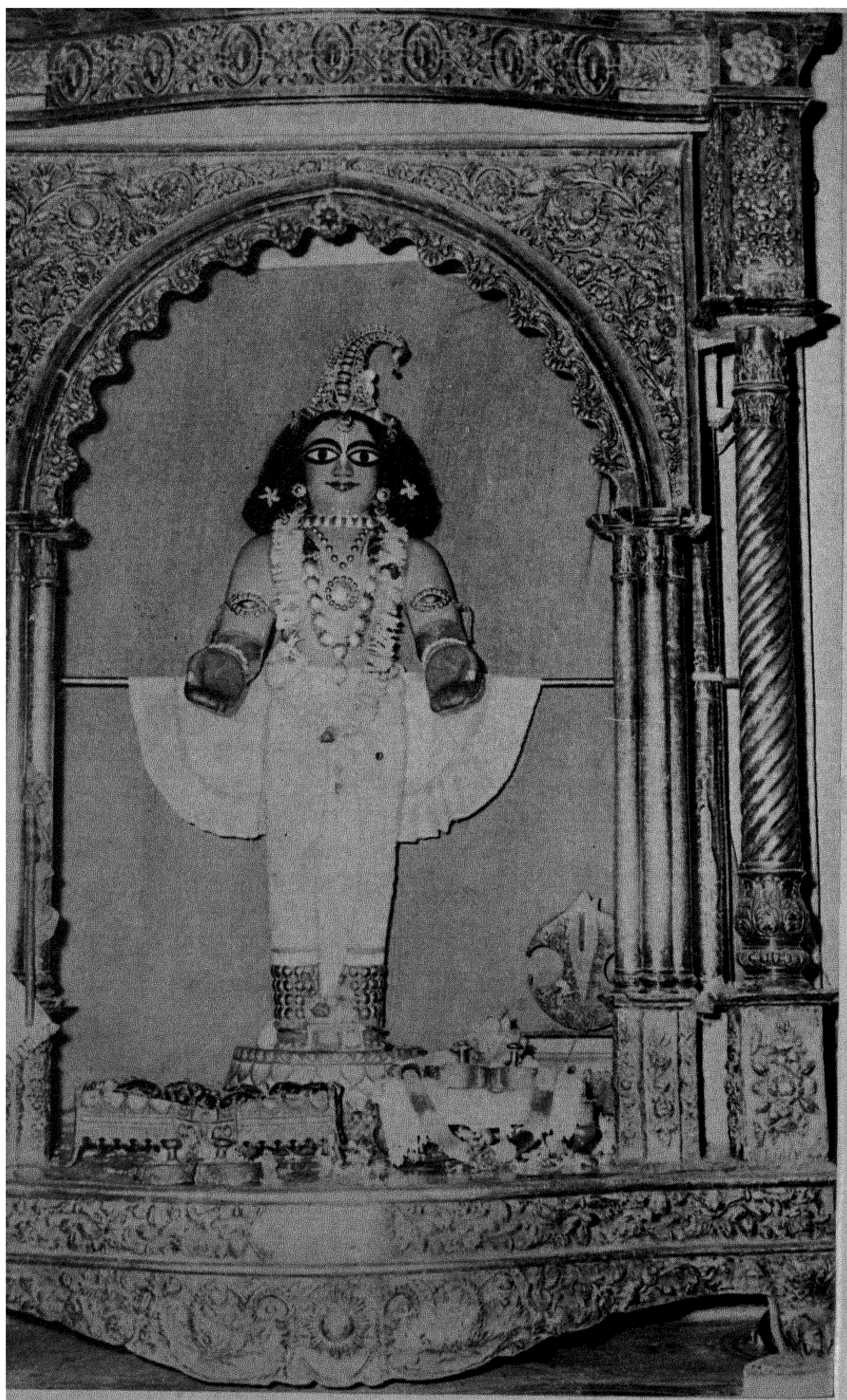


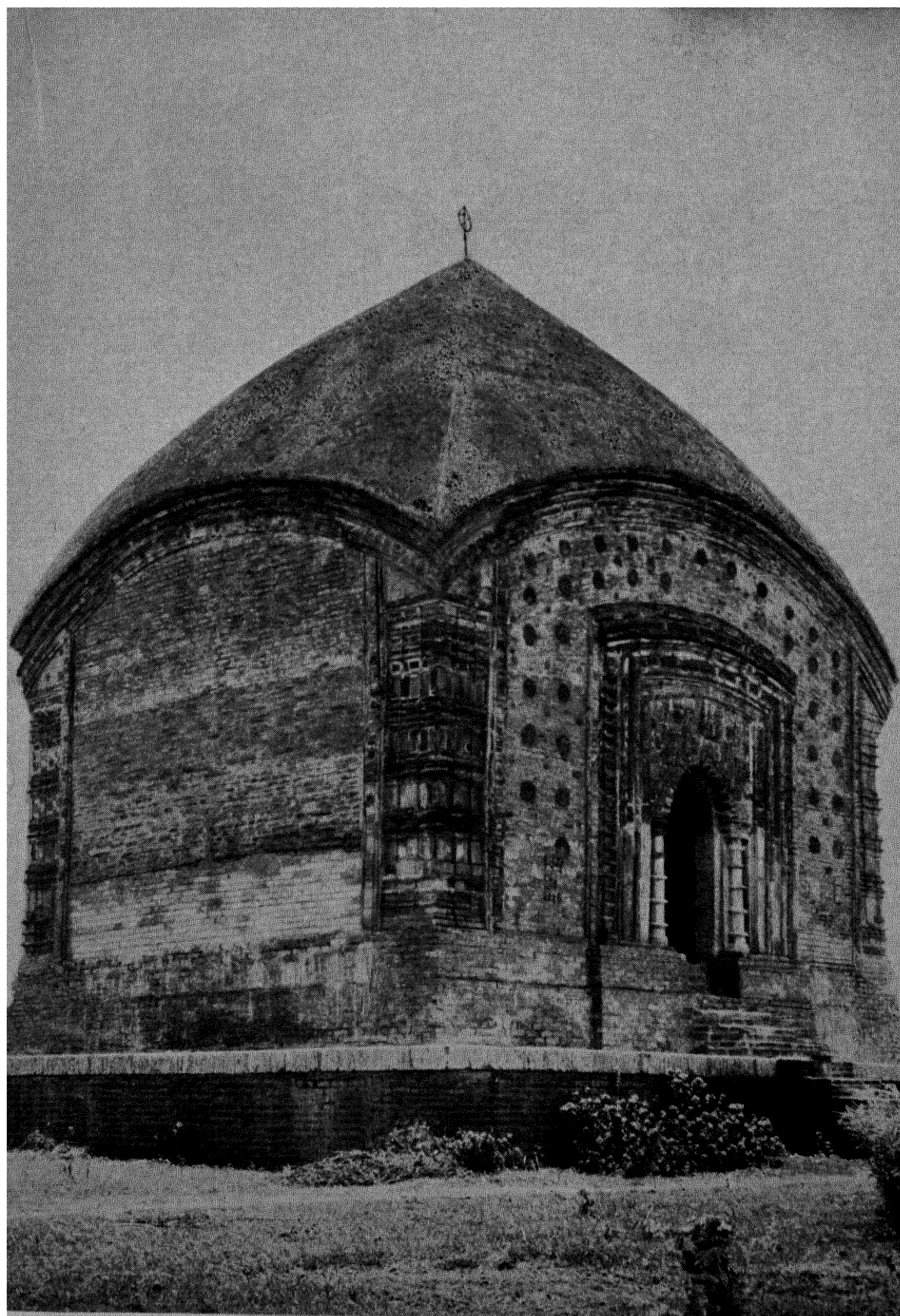
(১১) আংশিক ভগ্ন পাথরের নৃসিংহমূর্তি : দেপাড়া (পৃঃ ৩৮-৩৯)



(১২) ধ্বংসপ্রায় 'টেরাকোটা'-মন্দির : দোগাছি (পৃঃ ৪২)

(১৩) ধর্মদহে প্রাপ্ত কাঠের মন্দিরদ্বারের কারুকার্য (পৃঃ ৪২)





(১৫) ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ কর্তৃক সংরক্ষিত পালপাড়ার মন্দির (পৃঃ ৫০-৫১)



(১৬) তেহট্ট থানার বরেয়ায় প্রাপ্ত আনুমানিক খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি
(বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ পুরাকীর্তি সংগ্রহশালায় রক্ষিত)

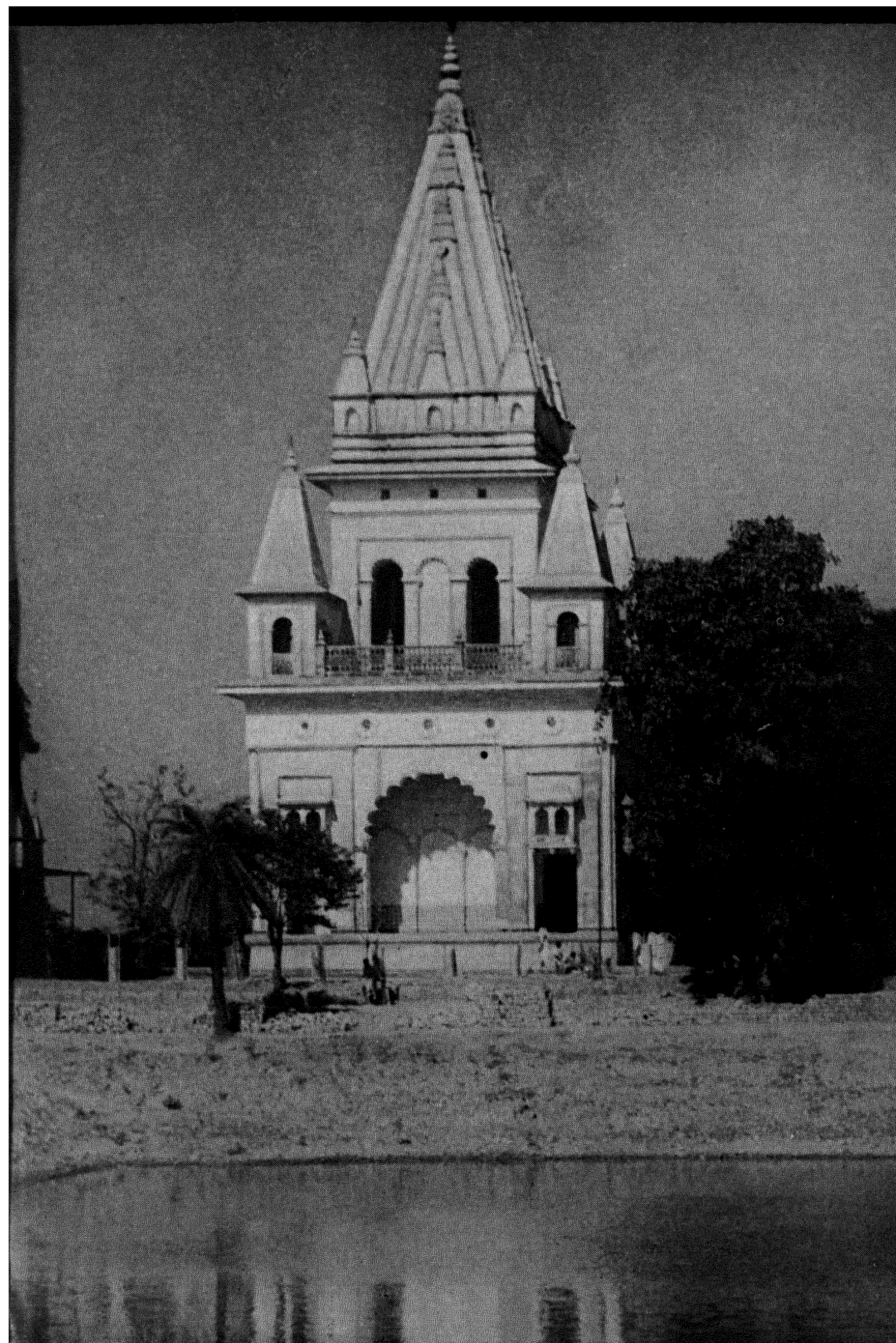
(১৭) চাঁদ কাজীর সমাধির উপর প্রাচীন গোলকচাঁপা গাছ : বামনপুকুর (পৃঃ ৬০)

(১৯) দুর্গা, কালী ও শিবমন্দির : বীরনগর (পৃঃ ৭১-৭২)

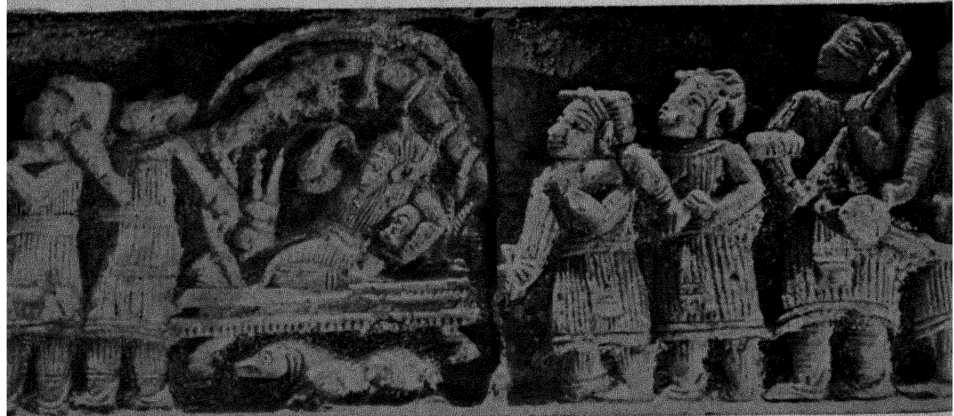
(২১) জোড়বাংলা-মন্দিরের স্তম্ভমূলে 'টেরাকোটা' সজ্জা : বীরনগর (পৃঃ ৬৯)

(২২) লুপ্ত চণ্ডীমণ্ডপের কাঠের কারুকার্যের নিদর্শন : বীরনগর (পৃঃ ৬৯-৭০)

(২৩) রুদ্রেশ্বর শিবমন্দির : মাটিয়ারী (পৃঃ ৭৮-৭৯)



(২৫) সুউচ্চ যোগপীঠ মন্দির : মায়াপুর (পৃঃ ৮২)



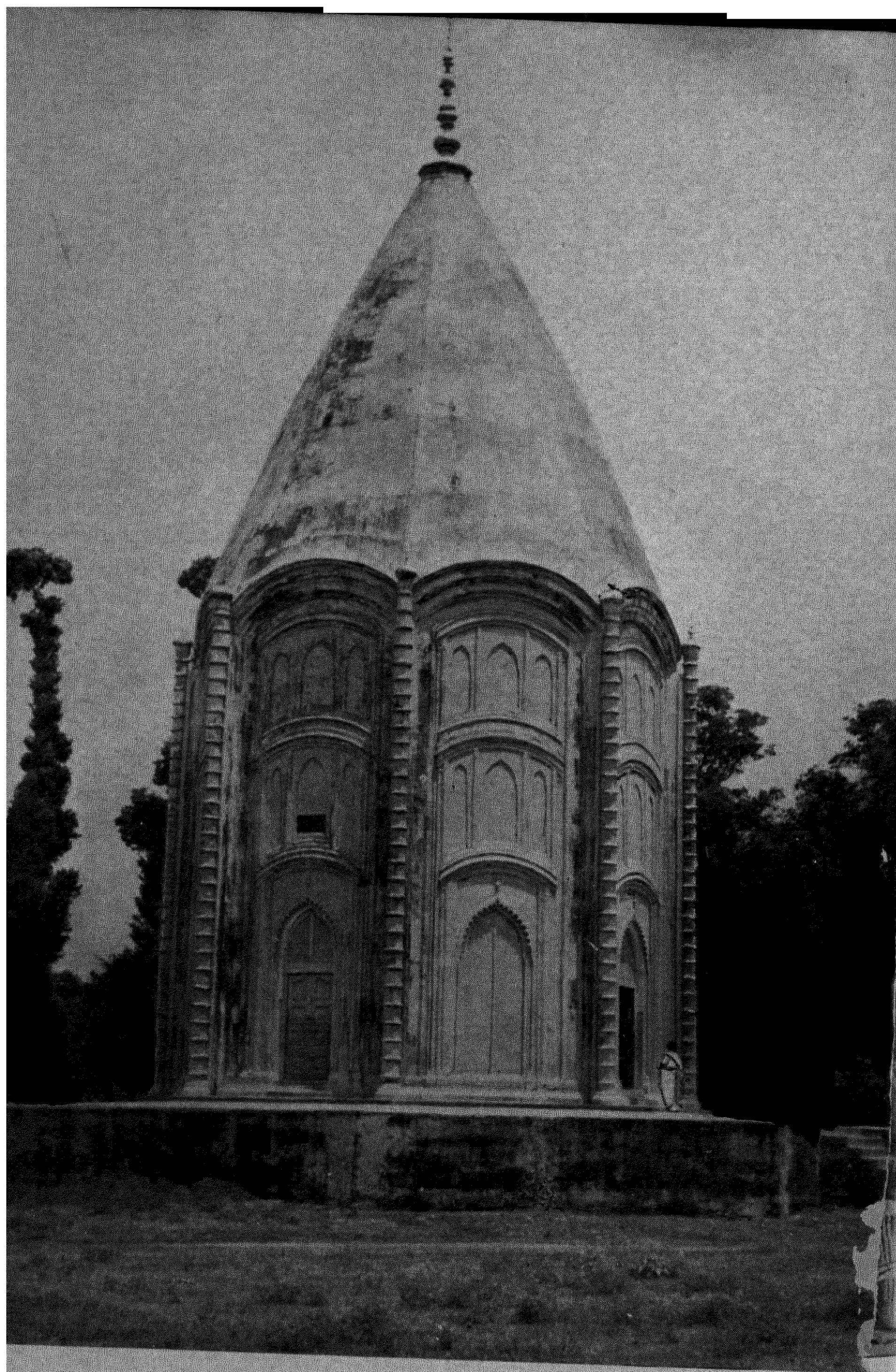
(২৬) সুবিশাল শ্যামচাঁদ মন্দির : শান্তিপুর (পৃঃ ৮৯-৯০)

(২৭) শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর মন্দিরে পোড়ামাটির অলংকরণ : শান্তিপুর (পৃঃ ৯১-৯২)



(২৮) আওরঙ্গজেবের কালে নির্মিত তোপখানা মসজিদ : শান্তিপুর (পৃঃ ৯৫-৯৬)

(২৯) পূর্বভারতের সম্ভবতঃ সর্ববৃহৎ শিবলিঙ্গ 'রাজরাজেশ্বর' : শিবনিবাস (পৃঃ ৯৮-৯৯)



(৩০) বিশিষ্ট গঠনরীতির রাজরাজেশ্বর শিবমন্দির : শিবনিবাস (পৃঃ ৯৮-১০০)